

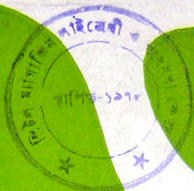
KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৬ নম্বর তামর, মনোহর, কল-৩২
Collection : KLMLGK	Publisher : প্রবন্ধ লিখিত
Title : অলিন্দা (ALINDA)	Size : ৪.৫"/৫.৫"
Vol. & Number : (প্রথম সংস্করণ) (দ্বিতীয় সংস্করণ) (তৃতীয় সংস্করণ) (চতুর্থ সংস্করণ)	Year of Publication : ১৬৭৭ ১৬৭৭ ১৬৭৮ ১৮০০
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : প্রবন্ধ লিখিত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

গ্রন্থ সংকলন

১৩৯৭



আলিঙ্গ

সম্পাদক
প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত



অলিন্দ

বাংলাসিক সাহিত্য সংকলন

গ্রন্থ ১৩৯৭



অরুণ মিত্র, সুদীনীল গঙ্গোপাধ্যায়, আলোক সরকার, কবিতা সিংহ,
দিবোদয় পালিত, অমিয় দেব, নবনীতা দেব সেন, শান্তিকুমার ঘোষ,
দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, মণীন্দ্র গুপ্ত, বিজয়া মুখোপাধ্যায় সামসুল
হক, দেবী রায়, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, ভাস্কর চক্রবর্তী, কালীকৃষ্ণ গুহ,
দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবারতি মিত্র, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কৌশিক
গুহ, কৃষ্ণা বসু, মঞ্জুভাব মিত্র, নির্মল বসাক, নির্মল হালদার, সুজিত
সরকার, প্রমোদ বসু, সুবোধ সরকার, অনুরাধা মহাপাত্র, শান্ত রায়,
দেবাঞ্জলি মুখোপাধ্যায়, সৈয়দ হাসমত জালাল, গৌতম ঘোষদত্তিদার,
মঞ্জিকা সেনগুপ্ত, চৈতালী চট্টোপাধ্যায়, সখম পাল, দিবা মুখোপাধ্যায়,
দীপ চৌধুরী, বিশাখা সরকার, শুকুভারা রায়, শীর্ষেন্দু চক্রবর্তী,
অমিতেশ মাইতি, উথানপদ বিজলী, কল্যাণ মিত্র, শম্ভু বসু, নিভা দে,
উমিলা চক্রবর্তী, কালিদাস চট্টোপাধ্যায়, রূপা দাশগুপ্ত, অরুণ দাশগুপ্ত,
সুদীপ বসু, সঞ্জিতা কুন্ডু, শ্যামলবরণ সাহা, জহর সেন মজুমদার,
বিশ্বজিৎ কুন্ডু, বিশ্বজিৎ পাল, দিলীপ ভট্টাচার্য, অমলেন্দু বিশ্বাস,
পিনাকীপ্রসাদ ধর, সবসাচী সরকার, অরুণ আচার্য, গৌতম হাজরা,
অরুণাশঙ্কর ভট্টাচার্য, অভীক মজুমদার, পার্থপ্রিয় বসু, পৌলমী সেনগুপ্ত
এবং প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

সম্পাদক : প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

প্রচ্ছদ : মেরিঅ্যান দাশগুপ্ত

প্রকাশক : উষ্টর পার্থ দাশগুপ্ত

মুদ্রক : স্বর্ণাঙ্কর

৩৯৯/২ নেতাজি সুভাষ রোড, হাওড়া-১

দাম : পাঁচ টাকা

কবির ভাবমূর্তি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

একজন কবির ভাবমূর্তি বা ইমেজ কেমন, তার ওপরেই নির্ভর করে তাঁর জনপ্রিয়তা, স্বীকৃতি, বই বিক্রি হওয়া, পুরস্কার পাওয়া বা না পাওয়া। এদেশে অনেক ভালো কবিরও কোনো ভাবমূর্তি নেই, আবার অনেক সাধারণ কবির ভাবমূর্তি খুব উজ্জ্বল। তিনি যদি সাম্যবাদী হন, তাহলে পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ পাঠকের কাছে—বিশেষত ছাত্রসমাজের কাছে—খুব স্বাভাবিক কারণেই তাঁর ইমেজ হবে বরণীয় বা অনুকরণযোগ্য। যারা এই নিম্নের ব্যক্তিত্ব, তাঁরা হয় অতিপ্রচারিত বা তাঁদের জীবনযাপন ও জীবনশৈলীর নাটকীয়তা জনমনরঞ্জক। এমন অনেক কবি আছেন যাদের আবেদন শব্দে তাঁদের অনুরাগীদের কাছে বা বিশেষ কোনো গোষ্ঠীর কাছে। এই গোষ্ঠী ছাপিয়ে বৃহত্তর কবি ও পাঠকের কাছে তাঁরা কখনো পৌঁছোতে পারেন না। কবিতার বাণিজ্যিক দিকটি নির্ভর করে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারের ওপর। এই স্বেচ্ছাচার হয়তো মূলকলেজের দপ্তর এবং লাজুক ছাত্রছাত্রী, কিন্তু তাঁদের পছন্দ অপছন্দ নিয়ন্ত্রণ করে কবিতার বইয়ের চাহিদা। কবিতালেখকেরা সাধারণত কবিতার বই কেনেন না, তাঁরা নিজদের বই উপহার দেন ও অন্যদের বই উপহার হিসেবে পেতে চান। এই পাঠকরাই বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করেন প্রকাশকদের। সব দেশের পক্ষেই একথা সত্যি, তবে এদেশের পক্ষে বিশেষভাবে সত্যি। যারা গদ্য ও পদ্য দুইই লেখেন তাঁদের গদ্য যদি জনপ্রিয় হয়, তাহলে তাঁরা কবিতার বইয়েরও প্রকাশক পান, কেননা তাতে প্রকাশকদের পরতা পূর্ণিয়ে যায়। একজন কবি নানাভাবে তাঁর ইমেজ তৈরী করার চেষ্টা করেন। আমার বন্ধু শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় (যাঁর কবিতার আমি ভক্ত) লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদকদের বলেছেন যে তাঁর কবিতা নিতে হ'লে তাঁর একটি কবিতা নয়, কবিতাগুচ্ছ প্রকাশ করতে হবে ও তাঁর কবিতা সর্বোৎসাহে ছাপতে হবে। যারা এই শর্তে রাজি, শব্দে তাঁদেরই তিনি কবিতা দেন। তাঁর শর্তের কথা জানলে তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য কবিরা হয়তো সেই সব ম্যাগাজিনে কবিতা দিতেন না। সম্পাদকরা, বলা বাহুল্য, এ-বিষয়ে নীরব থাকেন। লিটল ম্যাগাজিনে একেবারে না লেখাও বিপজ্জনক, আবার কারো কারো মতে (আমার নয়।) সব লিটল ম্যাগাজিনে লাগাতারভাবে লিখে যাওয়াও সমান বিপজ্জনক। অনেকেই ম্যাগাজিন একটা রাস্তা বেছে নেন। যারা “প্রতিষ্ঠানবিরোধী” (?) কথাবার্তা বলছেন বা লিখছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকে প্রতিষ্ঠানে লেখবার সুযোগ পাচ্ছেন না বলে ক্রুদ্ধ, আবার অনেকে অবশ্য অদর্শগত কারণে লেখেন না, সেই আদর্শ যাই হোক। আরোপে আন্দোলনে উদ্ভূত এই কবিসমাজকে আমি শ্রদ্ধা করি আমি যার অস্তগত। কবির ভাবমূর্তির প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসি।

আহ্লাদে গড়াচ্ছে এই শরীর

আহ্লাদে গড়াচ্ছে এই শরীর

একবার ফুলফসলে একবার বিষাকড়ে।

একটু গরল যদি উপচোয়, বাহার কত

সূর্য যখন ওঠে সূর্য যখন পাহাড়পার।

অশ্বকার সুগন্ধি হলে এই শরীরে সাপ

ফণায় নাচায় হাজারলাখ রায়,

ভোর-খণায় রান করে এক বৃদ্ধ ভালবাসা।

ব্রহ্মাণ্ডদীপ জ্বলে ওঠে গোলাবারাদায়,

মিহি গলার সরু লেগে এই শরীর

ভরপোলায় চল্‌কায়।

বেড়ালকুকুর যেখানে বাঁচে সেই বাতাস

জড়িয়ে নেয় বন্ধু এই শরীর,

ওপরে আঁকড়ের দোল পূর্বপশ্চিম ছায়ায়।

জলসাঘর রুমঝুমায় এই শরীরে,

হাঁরের বিন্দু করে মাতাল হাওয়ায়,

হেঁতাল-পাতা তবুও ডাকে, এই শরীর

ঝাঁপিয়ে পড়ে গজনের রাস্তে।

শাড়ির গাড়ির বাড়ির মেলায়

তালপাতার ভেঁপু বাজায় এই শরীর।

খুলোকাদায় লুটোপুটি এই শরীর,

ভারই মধ্যে দুকাঁধে কখন পরীর ডানা গজায়।

বাংলা কবিতা বা ভারতবর্ষের যে কোনো জায়গার কবিতাই এখন তিনটি খাতে প্রবাহিত হচ্ছে—এক, আঞ্চলিক; দুই, অস্তিত্বাত্মক; তিন, আন্তর্জাতিক। যারা তৃণমূলের কবি তারা প্রথমভাগে খুব প্রভাবশালী, কিন্তু এখন কবিতার অনুবাদ হচ্ছে সর্বভারতীয় স্তরে ও আন্তর্জাতিক স্তরে। এমন অনেক কবি আছেন যারা তৃণমূলের কবিদের কাছে বা তাঁদের পত্রিকায় কোনো পান্ডা পান না, অথচ সর্বভারতীয় বা আন্তর্জাতিক স্তরে খুবই পরিচিত। রনু বন্দ্যোপাধ্যায় নামক হাবরী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক মদ্রুপ বাঙালি অধ্যাপক যিনি অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশ করছেন, তাতে আলোকরঞ্জন নামে বাংলা কবিতার যে অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশ করছেন, তাতে আলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর কোনো কবিতা নেই অথচ আলোকরঞ্জনভক্ত সামসুল হকের কবিতা আছে। উৎপলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বা আলোক সরকার বা অমিতাভ দাশগুপ্ত বা পূর্ণেন্দু পরীর কবিতা নেই, আছে কবিরুল ইসলাম ও মৃণাল দত্তর কবিতা। যাদের কবিতা আছে, তাঁদের হয়ে করবার আমার বিন্দু-মাত্র ইচ্ছে নেই, কিন্তু যাদের কবিতা নেই তুলনামূলকভাবে তাঁরা স্রোতের কবি বলে আমি মনে করি। প্রসঙ্গত, যার কবিতা আমার প্রিয় সেই লোকনাথ ভট্টাচার্য্যর কবিতা অসংখ্য বিদেশী ভাষায় অনূদিত হয়েছে, ফরাসীদেশের অভিজাত প্রকাশনী গালিমার থেকে তাঁর বই বেরিয়েছে, অথচ এদেশে তাঁর কোনো প্রকাশক নেই। সাধারণ পাঠক তাঁর নাম পর্যন্ত জানেন না। শ্রীযুক্তোপাধ্যায়ের সংকলনেও তাঁর কোনো কবিতা নেই। সুধীন্দ্রনাথ একদা যে লিখেছিলেন তিনি কবিতা লেখা বন্ধ করলে বঙ্গসাহিত্য রম্যতলে মাঝে না তা শব্দে আমার সম্পর্কে নয় বাংলাভাষার অধিকাংশ কবিতালেখক সম্পর্কেই প্রযোজ্য। যা কিছু অসার কালের সম্মানার্থী তাকে কৌটিল্যের বিদায় করে দেয় এই সর্বজনসম্মত উক্তিও সত্য নয়, কেননা আমরা যাকে মহাকাল বলে তাকেও নিয়ন্ত্রণ করা যায়—স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন অনেক কবিতা দীর্ঘদিন ধরে পড়ানো হচ্ছে তা আদৌ কবিতা নয়, আর প্রায় চিরন্তন লেখ হয়েছে কিছু কিছু ভালো কবিতা শব্দে সাহিত্যের ইতিহাসে যাদের নাম পাওয়া যায়। যা করবার থাকে তা শব্দে কাজ, আলস্য মেশানো কাজ, নিরাসক্তি, যা সৃষ্টির জমিকে নাবাল করে করে রাখে, আর নিজের চিত্তবৃত্তি আর কর্মক্ষমতায় আস্থা, আর পাগল না হবার সংকল্প।

‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’ সম্বন্ধে শ্রীহরিশ্রী দেব ছন্দ-জন কবি সম্পর্কে আলোচনা করে আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। ছন্দ-জনের বদলে বারোজন বা চোদ্দজন বিষয়েও তাঁকে আলোচনা করতে বলা যেতো, কিন্তু বিষয় কবি নয়, শ্রেষ্ঠ কবিতা।

বৈশাখ, ১৩৯৭

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

বন্তের মাঝখানে

মৌমাছিটা শূকনো ফুলকে ছুঁলো না, সে কাল
ওখানে রক্তস করেছিল
বেড়ার ধারে সদা যৌবনবতী রক্তন ও টগরেয়া
নাচ শূকর করে দিয়েছে
সেজেছে খুব
গরুড়া গরুড়া বাঁধি খেয়েছে, নেশা করেছে
ভোরের বাতাসে চুমুক দিয়ে
ওরা ডাকে, বৃকের ওড়না খুলে ডাকে মৌমাছিটাকে
আমি এই রীতি-চঞ্চলতা উপভোগ করি, শূন্যে পাই
মৌন শীৎকার
বৈশিষ্ট্য না
একটা গম্ভীরমতন সবল ছাগল দু'পা উঁচিয়ে
বেড়ার ওপর মূখ্য বাড়ায় রাক্ষসের মতন
প্রেম ও ধ্বংসের শব্দের মধ্যে প্রথমে খুব একটা
তফাৎ বোঝা যায় না
ধারালো দাঁতে পিষে যাচ্ছে ফুলগুলো, তবু মনে হয় খেলা
ক্রমশ হতে থাকে রং ও সারালের বিনাশ
আমি বাধা দিই না, ওরা আমার প্রেমিকা নয়, মৌমাছির
এটা আমার বাগান নয়, ডাকবাংলো
ছাগলটাকে তার খিদের খাদ্য থেকে বঞ্চিত করবো কেন
লুপ্তি পরা, বেঁটে লাঠি হাতে একটা লোক
ছুটেতে ছুটেতে এসে ছাগলটার গলা পেপে ধরলো
নিশ্চুরভাবে ছাটিভাতে ছাটিভাতে নিয়ে গেল মাঠ পেরিয়ে
ঐ দিকেই বৃষ্টি কশাইখানা ?

কবরখানায় একদিন আমার খুব শীত লাগবে...

কল্পতরু

ছন্দ ছিল প্রথাসিদ্ধ। তবু
নতুন বাণী জানালো প্রার্থনা।
ভিমি ভিমি অমনি শূকর বাজন
যেন প্রভু রূপতরু, তিনি
ভালোবাসার স্বর্ণকলস আরো
স্বর্ণবারি উদার ছড়াবেন
শূকরমাত্র দু'হাত জোড় করা।
দু'হাত জোড় করেছি, ওগো প্রভু
গঠন দাও রূপ ও নিমিত্ত।

নিশ্চরতা আত্মনির্ভর
যেমন রাঙা সূর্য সপ্তমাণ—
জরামলিন আর্ত পটভূমি
ক্লমসিঁদুর উষ্ণ সঞ্জীবন
প্রথমতা অতলান্ত একক।
নতুন বাণী সপ্রতিভ তরু
পাহাড় নদী ময় জনপদ
মানবমান প্রভাত, ওগো প্রভু
বিশ্বধারা গহন বীণাপাণি।

ছন্দভঙ্গ

অক্ষত গৃহ্য লেগেছে সম্পর্ক
সম্পর্কে গৃহ্য লেগেছে ছন্দপাত
কবে ভুল হয়ে গেল সমস্ত নিভুল?
বনগোঁহুঁ খেয়ে গেল কবে শস্যপোকা?
বুদ্ধিনি কেবল ফাঁপা ছিল কা রয়েছে

বন্ধু বনে এসেছিল মুঁঝকো বোলায়
আসলে কি কালসাপ ওভাবেই আসে?
মৃদলশস্য রামদানা শাসি খেয়ে যায়

ভুল পায়ে চড়েছিল ভুলছুঁষি নিভুল আগুন?
এখন আগুন তার ইন্ধন জেলেছে ক্রমে
চুকে গেছে বৃকের গছীনে।

বিশ্বাস চিরেছে ফালা ফালা
খল আফ্জল তার বাঘনখ এ ভাবে দেখায়
পলক হলেও তবু খুলে যায় কখনো মূখোশ

সমস্ত সন্সার তার কিম্বদন্তি চক্ষু মেলো দেখে
নগ ভীরু নপুংসক দৃষ্টিধন উরু

হায় কৃষ্ণ কুণ্ডলিত জরগর তুমি
নাহলে তোমার
বহু শাড়ির মিলে লাগাতর ধরণা চলেছে!

কিছু অপরাধ হ'ল

কিছু অপরাধ হ'ল কিছু দেবী হ'ল
পিঠে বেধা ছোরা
হাতলে আঙুল ছাপ বন্ধুর আহা
মুছে যেতে হ'ল
বড় চেনা ছোরা
ক্ষত থেকে তুলে নিয়ে লোকচক্ষু থেকে দূরে
ফেলে দিতে আরো কিছু দেবী
রক্তবিন্দু মুছে নিতে
চলে গেল অনেক সময়

তবু যাঁছি চলে যাঁছি রাস্তা বড় কাঁকা
রক্তরেখা চলে যাচ্ছে চলে যাঁছি একা
এ ভাবে একলা যেতে হবে?
কখনো ভাবিনি
এ ভাবে নিহত হতে হবে?
ভাবিনি কখনো।

কিন্তু কিভাবে যাবে হস্তারক? আহা
নিষ্কণ্টক তবু হাত থেকে খসে যায় তালু
জানু থেকে পা
মাথার ভেতর থেকে উবে যায় কবিতার
জন্ম ক্ষমতা!

পঞ্চভূতের ওবা

(শ্রী বিমলকৃষ্ণ মতিলালের আয়ু ও আরোগ্য কামনায়)

প্রদীপের দৈদ্যতা বৃক্ষি একটু ট্যান্ডাই ম্যান্ডাই করছিলো।
কিছুদিন হোলো ঘাড় বোঁকয়ে বসে বলছে :
“আমি কি যে-সে ? কদিন আর
তোমার বৃক্ষের মথোকর প্রদীপটা জ্বালিয়ে
আমাকে খাটাবে ? আমিই হলুম গিয়ে
শ্রীল শ্রীযুক্ত পঞ্চভূত ! অমন
ওঠ বললেই উঠবো, আর
বোস বললেই বসবো ? এবার
হুকুমটা আমিই করি
আর তুমি বরং ওঠো-বসো !”

“তাই নাকি ?” বলে শ্রী বিমলকৃষ্ণ মতিলাল
পঞ্চভূতের দিকে একটু হেসে দিয়ে
দুহাতে দুটো লাঠি নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে
নিজেই বাগানে নামলেন।
সেমিনারের হল-এ যেতে যেতে
হঠাৎ থেমে, একহাতের লাঠি
ভুলে ধরলেন একটা সদ্যফটা
গেরুয়া ফুলের দিকে, বললেন :
—“দেখুন, দেখুন, এটা একটা
নতুন বানানো ফুল, এর নাম
রাখা হয়েছে, ‘লোকেশ্বরানন্দ’।
কী সুন্দর রঙটা, না ?” সেই মহাতে
বিগড়ে বসা শ্রীমান পঞ্চভূতের পিঠে
একমুঠো সর্ষে আর একটা কাঁটা পড়লো
স্পষ্ট শব্দ হোলো, শপাং।

ভৃদুগ

ভদ্রিল পর্বতমালার পিছনে মেঘেচাপা
সুখোদয়ের আভা
লঘু বৃষ্টির শব্দে দিনের শব্দ
পরিমুত করছে প্রতিটি পাখির পর
স্পষ্ট হয় সর্ষে-জন্যর গৈত
ভরু-লতার ফ্রেমে বধানো উজ্জ্বল ভূদুশা
এই বর্ণ-সমাহার, অই সম্মিলিত সুর
কার গলায় মালা হয়ে দুলছে

কেউ কি আছে

আমার পথ কি চলেছে ধূল পাহাড়ের টানে
যেখানে সূর্যালোক পান করবে বলে বেড়ে উঠেছে ভরু
ছাড়িয়ে হোয়ার-পিন বাকের পর বাক
নীচে ফেলে রেখে নগ্না-বোনো উপত্যকা, কক্কা-তোলা নদী
কেউ কি আছে ডেকে নেবে আমাকে বিশ্রামের চটীতে
দরজার বাইরে ফুলন্ত মহুয়া গাছ
রাগ্রে রোমাণ্ডিত
শুনাবো করামাত বারে ভরু
দিনের শব্দ হবে পাখির সর্ষ-বন্দনায়
রাগ্রে খলে সরে যাবে হিরণ্যম ঢাকনা

বুদ্‌বুদ্‌

এই যাবার সময়
ফুটে ওঠে ফুল
মনের মতন আসে পাখি
তাকিয়ে রয় স্বাদু ফলের দিকে

পাহাড় মাথা নুয়ে
পথ চেয়ে গুরুর
বয় সবুজ নদী
শেষত পাহাড় চিরে

নেই কেউ বিদায় দিতে
কে আছে পথ-শেষে
নিমেষে অস্ত্র মলিন
নীরব ডুবছে কালে

নইনট হয়ে আছে ঘর। বালি-খোলা দেয়ালে বড়ো করে করে
ছবি সাঁটাই—কে জানে কার মুখ। ঝুলে-ধামে বন্ধ হয়ে দাঁড়ালুম।
পূবে হাওয়া দিচ্ছে, জানলা ভাঁত সেই চমনধূপের গন্ধ।
বাইরে চেয়ে দেখি হাওয়াডাল থেকে বুদ্‌বুদের ফাঁপা পেড়ে পেড়ে
দু পাকট ভরছে একটা লোক, রঙে বুজে গেছে তার মুখখানা।

সিনারি

লোক আর খবরপত্তরের সিনারি ঘাড়ে নিয়ে নিয়ে ফিঁরি,
ফিরে দৌঁধ জঙ্গল খেয়ে ফেলেছে সমস্ত সামনেটা।
পথ-ওড়া সিনারির টুকরো এসে ফাঁস দিয়ে রয়েছে দোরখানা,
হাত দিতে ঝুঁকুঝুঁক করে ঝরে পড়ে ভাপ হিম কুঠ।

মোমবাতি

এই মোমবাতি এক জটিল উদ্ভিদ।

বিধবা মায়ের মতো রান্নাঘরে চোখের জল ফেলতে ফেলতে
সে ক্ষয়ে যায়।

বড়বোঁ যেদিন দুপুরবেলা চালাকাঠে মেরে ভাতের হাড়ি ফাটিয়ে
পা ছড়িয়ে গুম হয়ে বসে ছিল
ছোট বোয়ের মতো মোমবাতি সেদিন সম্মুখে বসে
ফিক করে হেসে
দমকা হাওয়ায় বাঁশবনের পথে মিলিয়ে গেল।

কতকাল সে গিজরি ধমসিঁ সগণীতের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেঁপেছে—
আমরা ভেবেছিলাম ঐ রকমই বৃষ্টি সে—
অথচ সেদিন নদীপাড়ে বেড়াতে এসে
মুহুর্তে আরশিচোখ মাছ হয়ে
লাফিয়ে চলে গেল গভীর জলে!

আজ বর্ষায়, এই ঘরের মধ্যে,
আকুল মন্দের তীরে স্বরে মোমবাতি ডাকছে—
ফিনিকি দিয়ে রক্তের মতো লাগছে গিয়ে সেই স্বর
চারদিকের সায়তা দেয়ালে।
আমিও আজ ঘরে টিকতে পারছি না—
আমি ওকে বনে, কনেদেখা আলোয়, জলঝরনো-গাছেদের মধ্যে নিয়ে যাবো,
সেখানে শেরাবকেলে শমীগাছের মাথায় আছে আগুনের চিহ্ন।

মোমবাতি এক অসাধারণ মেয়ে উদ্ভিদ।

না-জাসা

মাথা যে ভাবায় কথা বলে

মুখ তা বলতে পারে না।

কার কাছে গোপন রাখি, নিজের কাছে?

সে কীরকম কথা?

ধুব অনেকদিন আসে নি

তার না-আসার পেছনে থাকতে পারে

একটি মেয়ের পা ফেলা ও তোলা

একটি ছেলের চতুর স্তম্ভতা

অথবা অকালবৃষ্টির নীলসূতো

মুখ বলতে পারে না ঠিক কথা

ভুল লোকজনে ভরে ওঠে বাড়ি, দোকানপাট

রাষ্ট্রায় বাস্তব ঘুরে বেড়ায়, ওরা কারা

সভায় কবিতা পড়ে কারা?

ধুব না-আসা সয়ে যায়।

দেখতেই পাচ্ছি না

কতো নিচে নেমে গেছি দ্যাখো
তোমাদের দেখতেই পাচ্ছি না
এখানে অগুপ্তি কালো টবে
টুকরো আঁখি খুব ফুটে আছে
উপরে কি শীত না বসন্ত
বাবা-মাকে চিনতেই পারছি না
উপরে কি বর্ষা না হেমন্ত
এখানে অগুপ্তি লাল টবে
সোনার দাঁতেরা ফুটে আছে
উপরে কি গ্রীষ্ম না শরৎ
পুত্রদের চিনতেই পারছি না
কার ঠোঁটে আমার কনাকা

এখানে উল্লস অশ্বকারে
যৌন দৌড় কে পারে কে পারে
উপরে কি প্রতিযোগী আছে
ঘাসে গুল্মে লতায় বা গাছে

ঐ মৃত্যু-কে

[প্রয়াত রবীন সুরের জন্য]

ষাট-দশকের নাসিরে এক সাথে আনন্দ-
সম্মা উদ্‌যাপন নেই! আছে মতান্তর, দ্বন্দ্ব
আর অপবাদ! সে ছিল এক কাল মঙ্গলবার
গা-ছমছম রাতে, কপালের ফেরে

—তারশ্বরে, কে কেঁদে ওঠে এ?

আলুখালু এক রমণী আর অন্যথ কিশোর

—এরি নাম স্বজন-হারানো শোক?

চতুর্দিক আলোয়-আলোয় ছয়লাপ

তারই ভিতরে ঝপ করে, মেটে রঙের—

দোতলায় নেমে আসে এক কাল আঁধার!

আশপাশের প্রতিটি পুত্র ও কন্যার

শিউরে ওঠে বৃক! কালো ভয়ের সমন

বয়ে আনে সে কোন পেরাদা?

প্রথমে মনে হয়, উল্টোপাট্টা গুঞ্জব বটে!

কালো পোশাকে সঞ্জিত ভাব্যকার

গম্ভীর মূখে জানিয়ে দেন: যা রটে

তা অমোঘ সত্য...

লোভ হয় আমার-ও, ঐ মৃত্যু-কে ছুঁয়ে দেখার!

এতো দ্রুত ভেঙ্গে যাচ্ছে আমাদের পারস্পরিক ঘর,

কুচুটে মহাকাল

সে-ও দিলে না ভিক্ষা

মাত্র আর কয়েকটা বছর!

ভোম্বলের আশ্চর্য কাহিনী

১

কত শূণ্য কেটে গেলো। বসার ঘরটি থেকে

বেরিয়ে শোবার ঘর

বাথরুম

বারান্দা। বারান্দা থেকে বেরিয়ে

শোবার ঘর, বাথরুম

খাওয়া ও বসার ঘর।

এখানে মলিনা থাকে দুই মেয়ে নিয়ে। ওই

মলিনার আলমারি, খাট ও আলনা দেখা যায়।

মলিনা দুর্দিন নেই,

পাইকপাড়ায় গেছে দাদার বাড়িতে।

যদি কখনো না ফেরে আর মলিনারা—

ভোম্বল ভাবতে বসে।

ভাবতে ভাবতে

হঠাৎই গরম হয় ভোম্বলের মাথা।

মলিনা ভোম্বলের বো। আজ ব্যাংক ছুটি।

একা ঘরে শূয়ে শূয়ে ভোম্বল শূধুই

ভাবে আর ভাবে, যেন

কোনদিন আর না ফেরে মলিনা। যেন

না আসে মামাতো ভাই, শালা ও শালীরা

এবং এমনকি কোন বোকাচো বন্ধুরা।

এই ভালো।

এই একা এঘর গুঘর ঘরে এসে

হাজার হাজার ঘন্টা বসে থাকা। শূধু বসে থাকা।

২

মলিনা কখনো বাড়ি ছেড়ে বেরা'দিন

খুব একটা থাকে না।

দুর্দিন বছরে একবার পাইকপাড়ায়,

একবার চন্দননগরে যায় বোনের বাড়িতে।

ভোম্বলের ভালবাসা মলিনা বোঝে না—

ভোম্বল কাগজ পড়ে

ভোম্বল অফিস যায়

বাড়ি ফিরে টিভি দ্যাখে, রাতে

'মলিনা' 'মলিনা' করে গঠতো মেরে

মড়া মানুষের মত হাঁকরে ঘুমোয়। আজ

দুর্দিন এসেছে মোটে দাদার বাড়িতে,

অথচ এবার

মলিনার বাঁচোখ নাচছে বারবার।

বিকেলে, চা থেয়ে

ইচ্ছু ও ঋতুকে নিয়ে মলিনা হঠাৎ

'যাচ্ছি' বলে ট্যান্সি চড়ে বসে—বৌদি হতবাক।

কিছু কি হয়েছে?

কি যে হতে পারে বোঝে না মলিনা, কিন্তু

বাঁচোখ নাচতে থাকে দ্রুততর বেগে।

কোনই ঘটনা নেই মলিনার সমস্ত জীবনে—

এমনকি কিশোরী যখন

কেউ জোর করে চুমু খায় নি কোনখানে।

তবে হঠাৎ কি হ'ল?

মলিনা ভাবতে থাকে।

ট্যান্সি দ্রুত ছুটে চলে কসবার দিকে।

৩

হাজার হাজার ঘন্টা বসে থেকে থেকে

ভোম্বল বুঝতে পারে

জীবনে কিছুই হয়ে ওঠা হয় নি কখনো।

কিন্তু কি কি হতে চেয়েছিল?

কিছু কি সত্যিই হতে চেয়েছিল, হুম,

মনেই পড়ে না—

পাইলট, কাপ্তেন, মন্ত্রী বা মজান?
নাঃ, এসব কিছই সে হতে চায় নি জীবনে।
সে শুধুই চেয়েছিল ঠান্ডা, নিরুদ্বেষ
ভয় ও ভাবনাহীন একটি জীবন।

মিনুকে কি ভালবেসেছিল?

মিনু ছিল পরেশবাবুর মেয়ে, একই পাড়ার—
ধাঁকরে ভোম্বল
চিঠি লিখে ফেলেছিল মিনুকে সেদিন!
বহুকাল আগেকার কথা.....।

বেজে ওঠে বেল।

ভোম্বল দাঁড়ায়
হোট্টে যায় দরজা অবধি, ফুটো দিয়ে দ্যাখে
দুধ ও কাগজ নিয়ে
হরি ও প্রহ্লাদ দাঁড়িয়ে রয়েছে।
দরজা না খুলে
কিরে আসে ভোম্বল আর আবার হাজার ঘণ্টা
পার হয়ে যায়।

ক্রমশই দরজার কাছে জড়ো হতে থাকে
হরি ও প্রহ্লাদ ছাড়া সাধন, সরলা,
দত্ত ও দত্তর বৌ, নিচের পেরোরা—
ভোম্বল সবই বোঝে, তবু দরজা খোলে না।
বাথরুমে বহুমুখ কাজকমো সেয়ে
ভোম্বল জলের জন্য ফ্রীজ খুলে দ্যাখে
আশ্চর্য, অশ্রুত এক আলো ফ্রীজ থেকে এসে
ঘরময় ছড়িয়ে পড়েছে।

হঠাৎ
স্বপ্নের মতো মনে হয় সবকিছু, যেন
এমন জোৎস্নার জন্য সমস্ত জীবন
বসেছিল ভোম্বল, ভোম্বল

আলো আলো

ঠান্ডা বেগুন, আলু ও কুমড়োর পাশে
নিজের জায়গা খুঁজে পায়। বস্ফ হয়
গদরেজ। ভয় ও ভাবনা।

৪

ট্যান্ড থেকে নেমে মলিনা ছুটতে থাকে—

একতলা

দোতলা পৌরয়ে

খমকে দাঁড়ায়। তেভালায় তাদের ফ্ল্যাটের কাছে

মিঃ পেরারা, পেরারার বৌ, হরি, প্রহ্লাদ,
সাধন, সরলা, দত্তদার বড় ছেলে, দত্তগিনী
দাঁড়িয়ে রয়েছে, আর

দত্তদা সমানে দমাদম লাথি মেরে যাচ্ছে দরজায়।

ভোম্বল সকাল থেকে দরজা খোলে নি,

কেউই জানে না কি ব্যাপার—

এবার মলিনা রাজী হলে থানায় খবর দেয়া

যেতে পারে।

মলিনা নিশ্চুপ।

ইতু ও ঋতুকে নিয়ে দত্তগিনী নেমে যায় নিচে।

মলিনা বুকতে পারে কি দেখবে কিছুমুখ পরে।

হঠাৎ প্রচণ্ড ঝাক্স

দরজার পাছা খুলে যায়।

হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে লোকজন।

মলিনা নিখর, শুধু বসে থাকে। ভোম্বলকে

কোনদিন ভালোবেসেছিল কিনা

সে কথা ভাবতে থাকে।

বারেটা বছর একসঙ্গে থাকাকালিক, দু'দু'বার
ভোম্বলের মেয়ে পেটে ধরা, এর তো একটা মানে আছে—
সেই সব স্মৃতি এসে মলিনাকে কাঁদু করে দেয়।
এ সময় দত্তদার ছেলে এসে ডাকে—

‘ঘরে তো কেউই নেই।’

তবে ?

ভোম্বল কি বাড়িই ফেরে নি কাল রাতে ?

নাকি অন্যকিছু ?

সবাই ভাবতে বসে, ভাবতে ভাবতে দর দর করে

ঘেমে ওঠে সকলেই। সন্ধ্যা নেমে আসে।

মলিনার চোখ জুড়ে নেমে আসে ঘুম।

পরদিন,

ইতু ঋতু ফিঞ্জ খুলে চিবকার করে ওঠে।

দুত খবর ছড়িয়ে পড়ে। ছুটেতে ছুটেতে

আসে রিপোর্টার, টিভির লোকেরা—

সন্ধ্যায় বাংলা খবর

টিভির পদায় ভেসে ওঠে ভোম্বলের আশ্চর্য কাহিনী—

এক তাল জ্যাস্ত বরফ

হাত, পা, মস্তিষ্ক নিয়ে

মলিনার খাট থেকে নেমে

এগিয়ে চলেছে দূরে—বহুদূর বারান্দার দিকে।

ভাস্কর চক্রবর্তী

আরো অনেকেই একজন

কী একটা রবিবার। কালো কফিনের মতো দিন।

এখন দিনটাকে ফের তুলি দিয়ে সাদা রঙ করা।

জানলা দিয়ে রাস্তা দিয়ে ভেসে যাবো। আমি

এক কলসী গঙ্গাজলে ধুয়ে দেবো বাট হাজার মৃখ।

তার আগে, ছেঁটে নিতে হবে গোঁফজোড়া—

শাট-প্যান্ট সোয়েটার নিয়ে ঘেতে হবে ?

কাঁচি দিয়ে কেটে রাখা মস্তুখানা ঘরেতেই থাক

এ এক সুন্দর শাশি, হুজুরেব, আমি ভবু যাবো।

আমিও দ্বিতীয়বার লবণ-সমুদ্র স্পর্শ করি;
শরীরের—জীবনের—এ এক উৎসব।

অন্ধকার ছাড়িয়ে পড়েছে রক্তে, অবচেতনের জ্বরে, ঘুম—
পাখি ডেকে গেছে বৃত্তাকার।

অমৃত-কন্যার রাত্রি পার হয়ে আমিও ফিরেছি চর্যাপদে।

আবার নতুনভাবে জাগা; ওই আলো আসে...

নিষ্পত্ত বৃক্ষের মতো

নিষ্পত্ত বৃক্ষের নিচে আমার বসে থাকি—
কখন যে কথা শুনু হই বৃক্ষতে পারি না।
সমাস্তুরাল এক জীবনের দিকে শব্দ উচ্চারিত হয়।
তারপর গান
তারপর নিঃশব্দতা এসে গ্রাস করে সন্ধ্যার কম্পনা
তারপর কুরাশায় মিশে যায় সমস্ত বিলুপ্ত কাক
তারপর একে একে জ্বলে ওঠে রাত্রির মশাল।

নিষ্পত্ত বৃক্ষের মতো নিজেকে চিনতে পারি চমকে উঠে, শেষে।

গৃহসংজ্ঞার নামে ঢাল-ভরোয়াল দেওয়ালে
হিসেব কণ্ঠে দেখা
কী পেলে, আর কী কী খোয়ালে।

পেরেছে বিকস্মাথা তীর, হাড়ের গয়না
আর পালকের বিছানা,
হারালে আকাশের নীল, বনের ময়না
আর ঝিকি রাতকানা।

মজা পুকুরের পানা
অধিকার তার কম কিসে?
সে এসে ড্রয়িং রুমে মরে
জংলি তীরের নীল বিষে।

তালগুড়

ছায়াভপস্যার দিন শূন্য
ভাগুর মাছ আকাশে,
বাৎস্যায়নের ক্লাটবাড়ি
নীল জলে ভাসে।

কামসূত্রে বাঁধা বটগাছ
যেন আদিম জাহাজ
সুখী জলচাষে।

হাঁড়ি ফুটো হয়ে রস
গাড়িয়ে পড়েছে ঘাসে,
আমাকে পাগল করে দেখা
তালগাছ হাসে।

আয়ত আয়না

না বললে কি লোকে বোকে ?

তুমি কি নিজেও জানো তোমার অসংখ্য চোখ
আয়নার মতো আজ আমাকে দেখছে একা একা !

খাঁ খাঁ করে জলস্রোত—

টানাটানা লম্বা চাঁদ ঐ চোখ একমাত্র ভেলা।

এত ঢাকা এত চাপা জ্যোৎস্না

যেন শিরীষ গাছের ঠাণ্ডা ছায়া।

না বোঝালে মিল খুঁজে নিতে পারে কেউ ?

চেউহীন আঁতহীন

সমুদ্রের মাঝখানে সিল মাছের গান

তবু আধোঘুমে

সবুজ ঘাসের মাঠে হাম্ভারব বলে মনে হয়।

এতটা সশয় কেউ পার হতে পারে ?

ভেসে আসতে পারে—

সোজাসুজি নয়, কোনাকুনি নয়,

মোটে সৌন্দর্যই নয়।

বিভ্রান্ত তিমির মতো তলা দিয়ে ছুটে এসে

ফুটো করে দেওয়া ভালো

জাহাজের পেট ?

চোখে ফোট, মাথা হেঁট করে থাকি—

কি করে দেখব আমি, যা দেখবার নয় ?

ঢ় মেরে মাগের বৃকে ভেড়ার শিশুর মতো

নিরুপে বৃক্ষের ঢল বইয়ে দেবার দিন শেষ।

সরাসরি প্রপাতের নিচে শূন্যে

নিজেকে স্রোতের কাছে সঁপে দিলে

নিঃশব্দে রক্ত মাধাসুন্দর চোঁচে দেবে—

সব সমতল।

জলে বা আকাশে আমি যেখানে হাতড়াই

ভাঙা আয়না হাতে ফুটে যায়।

লোথা এক বুড়ি

বারুতেই আঁকা ছিল আঁকা থাকবে

সেই ছবি জুর রোদে বৃষ্টির ঝাপটে মুছবে না।

চিল্কিগড় রাজবাড়ির ভাঙা খিলানের কাছে

লোথা এক বুড়ি—

প্রায় সম্মুখে নেমে আসে

ধূলিকুহকের মতো চাঁদ,

ময়লা গালে চোখের জলের ছিটে তার জ্যোৎস্না,

অগড়ন মুখে মাটিমাথা,

পূর্দিনা ঝোপের গম্ব গায়ে ও কাপড়ে।

তিনতলা মন্দিরের তালাবন্ধ বিগ্ধ কি দেখেছিল

চারদিকে গোখুলির পোকাদের রাজ্যপাট,

র র র র-মোহটরানো ছেলে আরো কালো

অঝোর কালের দেশে চলে গেল ?

অম্বকারে নদীতেও স্রোত বন্ধ

তবে কোথা থেকে চিল্কিগড়ে বাতাসে এমন

অবিশ্রাম কাপড় কাচার শব্দ ?

কবে কোন খোবা রাজা ছিল ?

কে এখানে !

পরী, সাপ বা মাণিক্য,

প্রকৃতির চিলেচালা আঁচলের নিচে
 কার জন্য ধূকপুক ?
 এখনও সে লোখা বুড়ি বায়তেই আঁকা
 যেন কোনো প্রাণী নয়,
 কখনও কি প্রাণ ছিল তার ?
 পিঠে এক সদাকাটা মানুষীর উরুর মতন গুরুভার
 অজুর্ন গাছের গর্দভি বয়ে নিয়ে নিয়ে চলেছে তো চলেছেই—
 কতকাল কতকাল কতকাল
 তার মনে নেই ।

এডওয়ার্ড কামাউ ব্রাকেট

টম

ছড়ায় কাপাস
 কতকত বীজ

কত যে বিছন
 বাবাদের আশ

গজাও বানাও
 কাপাসদেশ

সবে চলে যাও
 পাতালদেশ

যেখানে ক্ষিপ্র
 কাসাভা ওঠে

যেখানে শুকোর
 রুগ্ন পিঠও

যেখানে জানে না
 কেউই জানে না
 কখনও জানে না
 বাঁচবে সে কি না
 ওদুধ বিনাই
 না কি সে মরবে ।

ফাঁ দাও তুলোর
 রুজের সুরে

স্বর্গ শৃঙ্খল
শিশির দূরে

ছড়ানো সবুজে
ঘাসে কত ঘাসে
গোরু চরাবার
মাঠে ঐপাশে

এবং কী যেন ঐ দেখা যায়
ভিজে ঘাসে মাঠে কি বা ঠাণ্ডায়
নোনতা স্বপ্ন যা মনে পড়ায়
হলুদ টেউয়েরা যেথা আছড়ায়
বালিরাড়ি জুড়ে আমাদের তটে।

ডোবাও আত'নাদগুলি, তট
জুড়াও কশার ঘাত উৎকট,
স্বপ্নকে রাখে শৃঙ্খল, নিকট,

কেননা আমরা আজও কিছ' যারা পাইনি নিজেরা
শৃঙ্খল কাজ করি
আজও কোনোকিছ' গড়িনি নিজেরা
স্বপ্ন গড়ি
যারা সবকিছ' ভুলে-ভুলে সারা
নৃত্য করি
আর বেপরোয়া এমনকী আজ প্লুরণ করি

যে-পথগুলোকে কোনদিনও আর মনে করবো না
আবার : আটুপানের উত্তি এবং ফসলগুলি
ছড়ায়, গড়ায়, আর উপজাতি আছে যতগুলো
আশাশুভে

স্বপ্ন দেখছি টুই, আনোয়িকি, এবং ঐ যে সোনাল বেদী
স্বর্গে যেনবেদী গ'ড়ে উঠেছিলো আমাদের এই জাতির জন্য
বিদ্যুৎ আর দীপ্ত বাটালি কাজ করেছিলো বলেই :
এবং এখন নেই কিছ' নেই

কিছ'ই যে নেই
কিছ'ই যে নেই

আমাকে কাজেই দাও, গান করি
কিছ'ই না-এর
কাজেই এখন
মনে করে নিতে দাও, এসো, স্মারি
কিছ'ই না-কেই
কাজেই এখন
বল দাও যাতে স'য়ে যেতে পারি
কিছ'ই না-কেও
আবার জানাও আমাকে এখন
আমার সকল হৃত সন্তান
কোনখানে তারা হারায় এখন

কিন্তু তাদের জাগাও, ওঠাও
হে নরমানব
হে দেবদেবতা
হে উবার ক্ষণ
উঠুক আমার যত সন্ততি
প্রভাত যে-পথে এগোয়, আসে
উঠুক, চলুক, পায়-পায়ে গতি
যে-পথে দীপ্ত রৌদ্র আসে
ছটুক মাঠে ও প্রান্তরে তারা
সকালবেলার রোদ্রে ছটুক

দেখক আকাশে কেমন উঠেছে
আছান-করা ইন্দ্রধনুক :
দেবতার বাঁকা আঁকুল বিলাপ
ডেকে-ডেকে সারা
শুনক তারা।

কিন্তু আমার সম্ভতি, তারা
সম্বলহীন, সহায়বিহীন
পাকে পড়ে গেছে, সে-কোন চক্রে
নিরাশাকুটিল অসহায় দল-
পতিহীন শেখে অসার মূর্খ-
তাকেই শৃঙ্খল, আর শেখে অপ-
দার্থতা আর দুঃখশোকের
যা-যা অবদান

হায় দুর্বল
রক্ত শিখাটি
হাওয়ার ওড়ানো
বিষভেতো কত
ফুলের মজুল
সব ধরে পড়ে
কত-কত অন-
ধ পথে আঁধারে

আর এই আমি নিরীহ বেচারী
ক্ষীণ দুর্বল
মিনমিনে টন
পিতা ও পালক
প্রতিষ্ঠাতাও
আকাট পাতক

পাকে পড়ে-যাওয়া

বর্ণনা করি
তাদের লজ্জা
তাদের শক্তি-
হীনতা দীনতা

অথচ দৃষ্টি
ক্ষীণ দুর্বল
হায় ছেঁড়ে না যে
শক্ত শিকল
লাগে না আগুন
তিস্ত শিখায়
যা দেবে দাঁখিয়ে
আমার ভীর্ণ
ধিকার, রোষ

কাজেই যে-আমি গড়েছি কেবল
কিছুই-না যে;
কাজেই আমি যে গড়িনি কিছুই
এই যত-সব জঞ্জালজাল আগাছা ছাড়া
মিথ্যা বিফল এই এতগুলো
বিছন ছাড়া
কেবল বার্থ অকাজ ছাড়া;
যা-কিছু গড়েছি
পলিমাটি নয়, গড়েছি বালিতে, ধূলায় ধূ-ধু,
বার্থ গড়েছি দুর্ভাগ্য নুনে
আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং স্বপ্ন;
ভুলে গেছি সব যা ঘটেছে সব
শৃঙ্খল মাঝে বুলি : হাঁ, মাশা, হুজুর

হা, মাসা, মনিব, মালিক, আজ্ঞে
হুজুর মালিক

আর টুপিটাকে
ধরে থাকি হাতে
লুকোবো বুকটা
বুঝি শৃঙ্খ তাতে
শৃঙ্খ এই আশা
একদিন যদি
সম্ভবিত সব
চোখ দিয়ে শোনে
চোখ দিয়ে জানে

নয় শৃঙ্খ একা ছড়ানো সবুজ
নয় শৃঙ্খ একা দূর আফ্রিকা
নয় শৃঙ্খ কালো রঙের চামড়া
শৃঙ্খ আতঙ্ক বিভীষিকা নয়
বরং কে ছিল কোর্তেস আর
জেক, মাগেলান
এবং ফার্দিনান্দ ও ঐ যে
হার্মাদ আর নাবিক, যারা
নোনা সমুদ্র ছিঁড়ে ফেঁড়ে এসে
পৌঁছে গিয়েছে শেষে এই দেশে।

অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পস্তারনাকের দুটি কবিতা
[জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে]

মাদকতা

বাগানে বাগানে আইভি লতার ঝোলে
বর্ষ নামলে খুঁজেছি আচ্ছাদন,
এই আবরণ বাহু বন্ধন ভুলে
দু হাতে তোমায় করেছি আলিঙ্গন।

আইভি ছিল না ; ঝোপের বলয় ঘিরে
মাদকলতায় কাঁথার আশ্রয়ণ,
কি যে হত ভালো বিছিয়ে দিতাম ধীরে
মাটির ওপরে সৃজনীর আবরণ।

১৯৫০

হামলেট

সব স্থির ; আমার প্রবেশ রঙ্গমঞ্চে।
দাঁড়িয়ে রয়েছি আমি দরজার গায়ে হেলে
ভাবি, মদু আর দূর প্রতিধ্বনি শনে
কি হবে আমার শতকের চলাচলে।

উঁচিয়ে রয়েছে রারি তার আলোছায়া
হাজার, হাজার দূরবীন যেন আমারই দিকে,
একবার যদি মনে হয়, বাবা, পিতা
পেরালা আমার তুমি নিও হাত থেকে।

কঠিন তোমার কাজ, তবু ভালোবেসে

অভিনয় করে গেছি এই ভূমিকায়

এখন চলেছে অন্য নাটকের পালা

দয়া করে ছুটি দাও এবারে আমার।

পূর্বে রূপায়িত দৃশ্য আর অংকগাল,

আগে স্থির করা আছে তার শেখকণ,

এখন ফরাইসিদের আমল, তাই আমি একা,

মাঠ পেরোনোর মত সোজা নর, জীবনযাপন।

১৯৫৬

মূল রূপ থেকে অনুবাদ : কৌশিক গুহ

কৃষ্ণা বসু

স্মৃতি কোন্ দ্রোপদীর শাড়ি ?

আজকে এসেছি আমি বহুদিন পর ঘনঘোর শস্যের দেশে, শস্যখোর
পাখিদের দেশে, বহুকাল পর আজ স্বদেশে এসেছি। মাঘের হিরণ
রোদে এই শীত কাল, পূর্ব-পূর্বের ভিটা, নোনাধরা ভিজে ইট,—
চেনাগন্ধ মাথা, জামরুল গাছের মাথায় বালিকাকালের রোদ,—জাকরান
রঙের, এইসব নিজস্বতা ভূমা ও ভূমির স্বভাব,—আজ বহুদিন পর ফিরেছি
নাড়ীর টানে, প্রাণসহচরদের টানে, ফিরেছি নিজের কাছে, এই বালি-
মাটি এইখানে তরমুজ ফলত খুব ভালো, প্রপিতামহের ষোড়শ বধা
থাকত ওই মহানিম গাছে, চিকন বালিকাকালের রোদ আজ ঘনঘোর
মধ্যাহ্ন পেয়েছে, থমথমে পীতরঙা ভরাট নিটোল দুপূর হয়েছে, দুপূর
হেলেছে শান্ত বিকেলের দিকে, যতদূর যাবে এই সাড়ে পাঁচটুট লোক
শরীরের যাদু, ততদূর যাবে এর মায়া ? কতদূর যেতে পারে স্মৃতি ?
স্মৃতি মানে সর্বস্বতা ? জাতিস্মর স্মৃতিজীবী, স্মৃতি কোন্ দ্রোপদীর
শাড়ি ?

রূপসী নামক নদী

রূপসী নামক নদী পৃথিবীর কোনখানে

নীল নভোচারী হাসিয়াও কেঁদে কেঁদে পায়নাকা তাকে
প্রেমাত্ম অবয়ব নিয়ে ভেবে ভেবে তার ওই সুতস্বী বহতা
তবু আমি হৃৎপিণ্ডে অনুভব করি এক অন্য শীতলতা

ডাকবাংলার ঘরে ভোরবেলা জেগে

কাঁধে শাদা তোয়ালে দাঁতে টুথব্রাশ

দ্বানঘরে কাটাই সময়; তারপর আয়নার টেবিলে এসে অনামনস্ক উদাস

চুল আঁচড়াই অথবা দাঁড়িয়ে থাকি অকারণে কিঙ্করূপ

এসময় আমার রক্তের ভিতর চেটে তোলে সমুদ্রের উষ্ণত্ব লবণ;

সাহসী সৌন্দর্যে শরীর আবৃত করে একা একা চলে যাই

চিরপথিকের রূপ নিয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে নিজজন অঞ্চলে

পূর্ণ জন্মের প্রিয় বালিকাকে খুঁজি

জানালার অরণ্য জাগে

আমাকে অরণ্য ভাকে তবু আমি অরণ্যের নই

মহাশিমূলের তলা চিরশূন্য, উবার গোলাপ আজও ফোটে

আমার হৃদয় নীলকুমারীর দেশে কবে ঘেন কার কাছে

গাচ্ছত রেখে এসেছি। তার সঙ্গে দেখা করা অত্যন্ত জরুরী

অধিকন্তু নদীটিকে পেতে হবে এই চিন্তা মাথার ভিতর

ঘোরে শূন্য ক্রমাগত, পরিপার্শ্বে ঝলসে ওঠে দূরত্বের হাতুড়ী

রূপসী নামক নদী ভূমি কোনখানে

নিহত হাঁসের দল তোমাকে কি জানে

অপরিশুদ্ধ মানুষের ভীড়ে পৃথিবীতে পা ফেলা এখন দায়

ভূমি কোন কুণ্ডলতার কোলে শূন্যতার চেউ হয়ে

এ মহাকর্মে রয়ে যাও

আমার জীবন জিজ্ঞাসা তীর হয়ে ওঠে, তার কাছে এসে ধরা দাও

বাসরে বধুর মত

পৃথিবীর দ্রুতগামী ঘোড়া

তার ছায়া আরোহীকে নিয়ে চোরাবাঁলি বৃকে ডুবে যায় আগাগোড়া
আমি সৌন্দর্যপুন্ডলীর কোমর জড়িয়ে কত রোদন করোছি

ফলবৃক্ষের তলে মধুরের বিশ্বস্ত প্রেমিক আসবে আবার

মনে হয় এইখানে জলপানরত এক হরিণের ঘাড়

লক্ষ্য করে দিবসের শেষ সূর্য লাকিয়ে পড়েছে একদিন

এইখানে বাস তাই চিরলাল, রাঙা গৃহ্ম জন্মায়, রক্তের

সংবাদ মনে পড়ে।

আমার শরীরে আজ কোনো রক্ত অবশিষ্ট নেই; স্নিত স্বরে

তবু নদী ভাকে...

সেই ডাক শব্দে স্বপ্নের ভিতর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার মতন

ভঙ্গী নিয়ে উঠে আসি তরুণীর তরণীতে

ভেসে যাই উৎসের দিকে, সেইখানে গেলে পাবো জীবনের হারানো রতন

সেই উৎস রূপসী নদী জন্মাতোছে প্রতিদিন তার নগ্ন ক্ষুদ্র সরলতা নিয়ে

আমি সেই অপূর্ণা অভিজ্ঞকে সম্বোধন করে বলি—

হে নদী হে মহানদী আমার মাথার নরম ধূসর শাঁস করুঁতে করুঁতে খাও

তবু কেন স্থলবন্দী হয়ে বাধা পাও?

তোমার সৌন্দর্যবন্ধন আমার বর্শীর সূরে অকস্মাৎ খুলে খসে যাবে

জলশ্রীর গতিপথ বিদর্শী অনুরাগে পথ খুঁজে পাবে

মমরিত মানুষের দিকে...

সংশয়

সিংফারটিতে এসে আবার মন খারাপ হয়ে গেল সিংফারটি
সিঙ্ক-এর জন্য। বেশ তো ছিল বিশাল এক প্রান্তর ওই বাড়ীটার পেছনে।
ন্যাড়া, শূন্য ঘাস-গজানো-মাঠ আর মাইল খানেক পরে দ্রুত এক নদীর
ধারে নেমে-খাওয়া রেখা। বেশ তো ছিল পাশের বাড়ীর ব্যাডমিন্টন
কোর্ট। সম্ভবেলা আলো জেরলে বেশ তো খেলতো দ্যুতি বোদি আর
তার বোন। কখনো-সখনো মিল্লড ডাবলস-এ ডাক পড়তো আমাদের।
হাফকা পালকের ওপর ভর দিয়ে আমরা এপার থেকে ওপারে চলে যেতাম।

কিন্তু সেদিন আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম, একটা নিচু-হয়ে-
খাওয়া লাল রাস্তার বাঁকে তেরছা দাঁড়িয়ে থাকা তোমার জন্য।
সেদিন অঞ্জু ছিল না, মঞ্জু ছিল না; তুমি তো আসইনি। তবে, তবে
কেন.....। তবে কী মাঠ-পার-হয়ে-আসা ডাকাতের ভয়ে, সেদিন
আমি আরো এগিয়ে এসেছিলাম সিংফারটি। তোমার জন্য! দ্যুতি
বোদির বোন, সে এখন কোথায়? লন্ঠনটা একটু উঠিয়ে দেখতো
পাঙেট পাহাড়ের আড়ালে কোন আলো দেখতে পাও কিনা!

কথা

আমার কথাগুলি
হাওয়া নিয়ে যায়
কথা বললেই সবসময়
হাওয়া নিয়ে যায়
কোথায় যে নিয়ে যায়

সাজশো বছর পরে তুমি শুনতে চাইলে
হাওয়া শোনাবে আমার কথা
জলের কাছে আমার কথা
ফুলের কাছে আমার কথা
ভাঙ্গা উন্মূলের কাছেও আমার কথা
জড়িয়ে যায়নি।

স্বজিত সরকার

নিরাকার শূন্যতায়

প্রতিদিন নতুন নতুন ভট পেন,
নতুন নতুন পরিকল্পনায়
নতুন নতুন ব্যাড
ঘড়ি নয়, আকাশে আকাশে ওড়ে রঙীন ফ্লিসবী।
তবু আজো কাক, আজো শালিখ-চড়ুই,
পাঁচিল থেকে পাঁচিলে বেড়ালের লাফ,
গরুর প্রশান্তি, কুকুরের চাঁৎকার।

নিরাকার শূন্যতায় ধীরে ধীরে সমস্ত আকার।

মানুষ কিভাবে যায়

নিজের বীজের ভেতর আদিম উলঙ্গ হয়ে
মুখ আর মুখোশ ফেলে
মানুষ কিভাবে যায়
আমি খুব লক্ষ করি আজ।

শিখা নিবে যেতে যেতে শূন্য বর্ণময়
গাঢ় অশ্রুকার!
শব্দ থেমে যেতে যেতে সরব স্তম্ভতা!
কথার মোড়ক খুলে চোখে পড়ে
কথাহীন ছায়া,
ছায়ার অধিক ছায়া—
হতবাক, প্রাচীন।

নিসঙ্গীম শূন্যতার শূন্য নিরতিমান
অন্য এক পূর্ণতা থাকে।

আমি জানি, আগনে পুড়তে পুড়তে একজন মানুষ
কোথায়, কিভাবে যায়!

পিপাসাপাত্র, তুমি ছোট ভাই

জলের সঙ্গে তুমি চোখের নিম্নে আজ এ কি খাওয়ারে?
আমার শরীর থেকে অশ্রুর লিঙ্গের মতো কি যেন বৌরয়ে
পাজামা সমেত নিয়ে ধীরদ্রীক ভেদ করে ভেতরে ঢুকলো।
আমিও নিমেষহারা, অচেতন যেন কিংকর্তব্য না বুঝে
রেখেছি তোমার হাতে হাত, পারো যদি কেটে নাও, পারো যদি
ঢালো বিষ আমি বিষ কখনো খাইনি, ঢালো জিবের ভগায়
যেখানে মানুষ ফেরে, রাত্রি হলে ফিরে আসে যেখানে পাখিরা
যেখানে নৌকা ফেরে, তেজপাতা নিয়ে ফেরে নির্ধারিত ট্রাক

আমি সেই চলমান ট্রাকে, বস্তা বস্তা তেজপাতার ভেতর
ট্রাক নয়, আটটাকা ফুড়িরপু, যেন সেই রিপূর ভেতর
তোমার সঙ্গে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি, এতো ঘুম, ঘুম থেকে
আমি আর উঠবো না, এইখানে শতবার সুবোধ সুবোধ
বলে ডাকলেও জাগরণ আর নয়, কে সুবোধ?
যে যার মাথার দোষে, মদ খেয়ে, যন্ত্রণায় ঘুমিয়ে পড়েছে।

২
আবার পুরনো ব্যাধি ফিরে এলো যা কখনো ওষুধে সারেনি
মুখের ভেতর স্তন, যেন পাখি, তবু আমি স্তন্যপান করি।
দশ পয়সার লোভে যেভাবে ভিখারি হাঁটে চন্দ্রপথ ধরে
আমি সেই বলরাম স্ট্রিট ধরে সেই হাড় হাতাতের মতো
তোমাকে পেয়েই সে কি উল্লাস যেন চাঁদ বেড়াতে এসেছি
শূন্য চাঁদ আর চাঁদ আর চাঁদ, চন্দ্রদোষ ওষুধে সারে না।

আমার শরীর তবে মেঘছেঁড়া গোলাপের উপযুক্ত নয়?
না হোক আমাকে তুমি রিকশ করে জলযানে অগ্নি নিয়ে চলো।

এক জলযান থেকে আমি অন্য জলযানে লাফিয়ে নামবো
যেন এক জন্ম থেকে অন্য জন্ম এতো কাছে, যেন বেপাড়ার

নারিকপুত্রের মতো তোমার নৌকোভাড়া মিটিয়ে দিলাম
মেটেন চোখের খিদে, মেটেন পেটের দাউদাউ, জল লেগে
জল আর জল লেগে ক্ষয়েছে যক্ষ্ম, কি হবে যক্ষ্ম দিয়ে
যদি নাই ভালোবাসি, রাগে যদি নাই আসো আমার নৌকায়।

৩

চন্দ্রপথে আমি ছাড়া অন্য কোন প্রাণ আজো প্রবেশ করেনি।
চন্দ্রপথ মানে তুমি, চন্দ্রপথ মানে সেই প্রায় সড়ক,
উন্মাদের মনে হলো নিজের উরুর মতো এর মৃত্তিকা
যেন মানুষের পিঠ, আমিও উন্মাদ বলে মৃত্তিকা সরিয়ে
আবিস্কার করি প্রাণ, পিঠের ওপরে লেখা, 'পথ হারিও না'।
তুমি কি জানতে কিছ; মাফটারের ছোট ছেলে এপথে আসবে?
'পথ হারিও না' এই শব্দরাশি কাকে দিয়ে লিখিয়েছ তুমি?
মানুষ নিজের পিঠে নিজে যেহেতু লেখে না, লিখতে পারে না
আমি তাই ছোট মুখে প্রশ্ন করেছি 'বিপুলো পৃথিবী' নিয়ে
পুরুষ বন্দ্য হলে বলা কেন অরণ্যের আব্দু কমে যায়?

তোমার জরায়ুপথে অন্য কোন প্রাণ আজো প্রবেশ করেনি
তুমি ওঠো জল থেকে ভুবে থাকা নৌকোর মতো তুমি ওঠো
আমার স্কন্ধে রাখো মাথা, এই উরু, বসো উরুর ওপর
মাটি মাথা বুক, এই নাও, লেখো এইখানে, 'পথ হারিও না'।

৪

মাথায় কমেড নিয়ে গোবুলি চিঁক ধরে সমুদ্রে এলাম
গুধোয়া জলের থেকে জলধিকে এ জীবনে সরাতে পেরেছি?

চিঁকের কথায় আসি, যদি আমি কোনদিন অস্থ হয়ে যাই
হে পিপাসাপাত্র বোলো কখন পুঁলিগ ঢোকে কখন মানুষ
ভ্রমশ আন্নার দোষে, যদিও আন্না মানে তেপার্যা কছপ
আমার পিঁন্ডি নিয়ে সে নাকি আকাশপথে বিহারে ঢুকেছে।

মাথায় কমেড নিয়ে এ জীবন রেখে বলা কি হবে আকাশ?

তোমাকে না পাই যদি চোন্দ্রবার বসি করে আমি মারা যাব।
কেবল ভুট্টো খেয়ে কতলোক বেঁচে থাকে, কতলোক বিষ খেয়ে
মরেও মরে না, আত্মহত্যা না করেও বেঁচে আছে এতো লোক!
আর আমি পারবো না? ভাইকে তাড়িয়ে ফিরে এল ছোটভাই
পিপাসাপাত্রের মদ, ছোটভাই, তুমি কেন আমাকে ধরেছ?
কতটা পারদ তুমি কতটা জীবন আমি কিছই জানি না
পা বাঁধা বাঁড়ের গায়ে মাথায় কমেড নিয়ে আমি লিখে চাঁল।

অনুরাধা মহাপাত্র

অসমাপ্ত ছবি

পাখির ডানার নীচে অজস্র পাখির ঠোঁট
এই ছবি অসমাপ্ত রেখে, সন্ধ্যার আগে
গাঁজার শিকড় পেয়ে ভাবলেন, গাছেদের
ঋতুকাল কবে আসে—ভ্রমর ও অন্ধকার জানে;
চাঁদের কণার মতো নেশা ঠিক মস্তুর বিপরীতে
চন্দ্রবিন্দু হয়ে তার কপাল জ্বালায়;
সীসা কারখানা থেকে চিরজীবিতের মতো প্রস্ফো
নেমে পড়ে কালো জলে—আবার আদরে
চাঁদের কপাল চিরে চাঁদ ওঠে—
পাখির ডানার আড়াল, সেই গর্ভবিন্দুবৎ হাহাকার
মনে করো পাখিদের অস্থতা ছাড়া কিছ; নেই—
শব্দ ছুঁলে শিমূল, জলহীন মাঠে ঘুরে মরে,
কিছতেই আঁকতে পারে না—থার্ডালানো মৃন্ডমালায়
যদি তার মৃন্ড চিনে নিতে না পারে...*

সবুজ আলো

একটি কবিতা লেখার পর চোখে কষ্ট হয়েছে তার
তাই ওর ঘরে জ্বলছে এখন সবুজ আলো

চোখে হাত দিয়ে শূন্যে আছে সে—অস্ত্রে অস্ত্রে হাত নামায়—
এই ঘরে শূন্য একটি জানালা খোলা

সবুজ আলোর ওপরে শেড় তার মাঝখানে এ্যাটোটুকুন
সবুজ রঙের ল্যাম্প

সবুজ আলো, তুমি তো কোমলপ্রাণ,
ও সবুজ আলো, কবিকে ডাকো, কবির দৃঢ়তা ভালো করে দাও
শিগুগির—

কবি তোমাকে বিপদে ফেলবে না।

যীশু

যেন মেঘশাবকেরা খেলা করছে রাতের আকাশে—আর
নক্ষত্রেরা এক একটি ছোটো-ছোটো বাড়ি
ওর মধ্যে একটি বাড়ি থেকে যেন বাঁধুখুঁড়ের মতো

এক ব্যক্তি বেরিয়ে এলেন

বেরিয়ে এলেন তিনি, বেরিয়ে এলেন তিনি, বেরিয়ে এলেন...

রঙ্গমঞ্চে

প্রত্যেক মুহূর্তেই প্রস্তুত থাকতে হয়।
যে-কোনো সময়ে চলে যেতে হবে।

দু' এক জন্মান্তর আগে
এরকম ছায়াটে দু'পুত্র এসেছিলো।
কালো পায়ে নেমেছিলো
শনিমন্ডর খ্যাঁপাটে মৃত্যু।

চালকগণর মত ছোটো একটি চড়ুই
তার দু'সর পালক ফেলে বলে গিয়েছিলো
মৃত্যু আনবো।

মৃত্যু এলো না তবু
সেইসব জন্মান্তরে।
শূন্য এক ছায়াটে দু'পুত্র এলো
জনমান্তর সৌন্দর্য স্মৃতির মতন
বহুজন্ম পরে।

মাটিতে তবু বাগান তৈরি হয় না।
উঁচু নীলে রেয়ে থাকি রোজ, রোজ,—
যেখানে পরা মমতায় সৃষ্টি হয়
লক্ষ লক্ষ সবুজ গাছ।

অন্য জন্মের কথা

আমি এই রাত্রির চোখের জলের নদী কী করে পেরোবো

একদিকে হাঙরের ক্রুদ্ধ ব্যাদিত মুখ

অন্যদিকে জ্যোৎস্নায় খেলা করে রূপোলি মাছের ঝাঁক

মাঝখান দিয়ে আমাদের রাত্রি চলছে ভেসে

আকস্মিক জেগে ওঠে ক্ষুদ্র পৃথিবীর প্রাণ, জলের ভেতরে আগেরাগিরি

আমি অন্য গ্রহের থেকে এসেছি বলছি কি

ধামাতে পারি না এই ক্রুর জলকোলাহল

আর অলৌকিক নৌকোটি ভেঙে খান্‌খান্‌

ওগো অশ্রুলালী আপন মায়া, ওগো ললিত-বসন্ত,

তোমার হাত ধরে সাঁতারে চলছি, কোনখানে তুমি ডাঙা...

কুরো ও মাছের উপাখ্যান

নিবিড় বনের মধ্যে এক নির্জন কুরো

আবিরল অশ্বকারে

নেমে গেছে কোন সুন্দর অতীতের দিকে

একা, একেবারে একা...

পথ-ভালা এক পথিক-মাছ এসে পৌঁছল

কীভাবে যে সে-কুরোর সমীপে একদিন!

অশ্বকারের প্রশান্তিতে মাথা নুয়ে যায় তার

প্রণামের মতো ঝুঁকে চুম্বন করে সে

কুরোমুখে, গুহ্মের গায়ে-মাথায়

দৃঢ় হয়, সন্মত হয়, যেন-বা পাথর-স্বামন্তক!

তারপর, তারপর সে-এক ভীষণ কাণ্ড:

ঝোপে-কাড়ে সাড়া পেয়ে, তাড়া খেয়ে

ছুটে যায় ঝাঁকে-ঝাঁক খরগোশ!

ঝাঁপিয়ে পড়ে সে কালো জলে, যেন উপগত, যেন

আত্মহত্যা-প্রবণতা তাকে টানে বশ্বুর মতো

অন্তল গহ্বরের দিকে, যেখানে ভাসছে

ভাঙা চাঁদের টুকরো চিরকল্প!

পাথরে-পাথরে পরাগে-পাথরে সাঁতারে-সোহাগে

সোহাগে-মৃত্যুতে কী যে ঘটে যায়

সব অলৌকিক পর্ব তারপর!

তারপর, তারপর আর কিছ্‌ মনে নেই তার,

মনে নেই অন্য কিছ্‌ আর:

কেবল কুরো আর মাছ, মাছ আর কুরোর

প্রবল গুহ্মের ওপর অঝোর বৃষ্টি নামে

নামে ঘুম, কিছ্‌ পরাবাস্তব, ধূমে যায়

ধূমে-ধূমে যায়!

উপকথা

সাতটি যুবতী মাঝ নৌকো বেয়ে ধীপে নেমে পড়ি
কিন্তু গহনাগুলি আমাদের বাগিচাপুরা
জলশয্যা শাদাবালি কাটাগাছ কুমীরের ডিম
অতিক্রম করে নামি বনের গভীরে

রাঘবেন্দ্র দেবতা এখানে
কুমড়া পাতার মতো সবুজ শরীর
বিভারিত দেহপট, খুলে রাখা বাঁট ও গাজর
বসেছেন গাছের ছায়ায়
কিন্তু কবাহিনী চুবুকের মতো ওড়ে তার দিকে
সাত রাগিণীতে বাজে আমাদের চোদ্দটি তবলা
অরুণি পাব'ণ
কিন্তু তাঁর গটে বাত, শরীর বাঁকে না

জলশয্যা শাদাবালি কাটাগাছ কুমীরের ডিম
একে একে এসে সব জড়ো হয় কৌতুকের লোভে

নিরুপায় রাঘবেন্দ্র স্বর্গহেঁড়া বিধান দিলেন
আজ থেকে এই বন মাতৃভাস্কর্য্য।

হাসপাতালের দিকে

প্রথমেই আমরা রিজ পেরোলুম। তারপর ভয়। নিস্তার পাওয়ার জন্য
আমি শূন্য করেছিলাম ছোটবেলার গল্প। আর আমার চোখ থেকে
দূরবীন কেড়ে নিয়েছিলো তুমি।

বিপত্তারিণীর রত করতাম তখন। আমার থান পরা রোগা দিদিমা
ব্রতকথা-র শেষে শান্তিঙ্গল ছিটিয়ে বলতেন : এর পুণ্যফলে কখনো বিধবা
হ'ব না। আমার লালসুতোর তাগা কতবার যে হিঁড়ে পড়েছে
আঘাটায় !

সিটি দিতো ছেলেরা। কাদিতাম আর পানপাতার মুখ ঢেকে ছুঁয়ে
উঠতাম শূন্য। কারা কনেচন্দন পরতো আর কারা-ই বা মুঁড়িয়ে
দিতো, কে জানে !

আজ আবার মনে পড়লো সব কথা। আজ তুমি খনার গল্প বললে
আর শুনতে শুনতে খসখসে হয়ে উঠলো আমার জিভ, লাল হলো
চাউনি, শুনতে শুনতে আমি ডাইনি হয়ে উঠলুম।

আজ আবার মনে পড়লো সব কথা। হাটতে হাটতে রিজ পেরোলুম।
তারপর একটু ঠেলতেই গেট খুলে গেলো। মুছে গেলো ওয়ধের ঝাঁক।
মুছে গেলো অ্যাপ্রন পরা নাস' আর শব্দ। হাসপাতাল এখন আমার
বুকের ভেতরে।

গাড়্‌রাসিনি-কথা

চলেছে তোমার গাড়ি গাড়্‌রাসিনি বেলপাহাড়ী চলেছে অনেক দূরে নভে
যতো বেদনার বউ পরিগ্রাহীন কেউ সঙ্গে যাবে প্রীতিরঙ্গ-ভবে

তুমি যেতে চাও একা পাহাড় ও পাখি-দেখা বুনো শালে শৈবাল পাথর
ভব্‌ এরা জোর ক'রে মায়ামান পিছু খ'রে কে'দে কে'দে ডাকছে চাতক

তুমি পূণ্য চাও না তো ঠেত কি অষ্টেরতর চাদে শব্দে হাতের শরীর
তোমার ম্বল্ল ভব্‌ 'বাবুন, বাবুন' ব'লে এরা বাখে কলঙ্কিত শিকল বাধির

চলো গাড়ি নিয়ে চলো এত ভরা কলসীজল ও চিঁড়ে ফলা গড়
তুমি না ছ'লেও এরা বাড়ায় যে লক্ষ সরা তারও কিছ' গান আছে, সুর

হদরা মোড় ভুলাভেদা পথে শব্দে রঙ্গ ধাঁধা ফল কিন্তু সম-সম হবে
নির্জন লোভীর সঙ্গী এই শত পাপী রঙ্গী মৃচ্ছাদে ফোটায়ে বৈভব

স্মানেটোরিয়ানে

কিভাবে চুকেছে সেই কাঁচঘেরা বাড়ির ভেতর তার জানা নেই
সবজ্ঞ ঈশ্বর এক স্মিত হেসে দাঁড়ালেন আতুরের পাশে
কিভাবে রোবট সব মানবের মত গেয়ে উঠল গান
লতাপাতা ফুলে যেন ভরে গেল কাঠের টোবল

কাঁচের ওদিকে ভেসে গেল দূরে এক শান্ত হিম মেঘ
স্মানেটোরিয়ামে শব্দে সারারাত জ্বল গেল টিমটিমে আলো
কিভাবে সারানো যাবে শেষ চেষ্টা অব্যর্থ আধারে—
বিন্দু বিন্দু রসায়নে তৈরী হয় আরোগ্য-ফর্মুলা

আকাশ পাল্টায় দেখো! ছোট্ট এক হলর-মেশিন
ঘূমের ভেতর থেকে তাকে তুলে এনে বলে 'ভালবাসি'
হঠাৎ ঝড়ের মধ্যে দূলে ওঠে ফের এক ভাঙল পৃথিবী
বৃষ্টি নামে, ঋতু চন্দ্রাহত মাথার ভেতরে।

'অগ্নি'-পরীক্ষার রাত

হাউই ওড়ানো রাত তুমি কাকে ভুলে যেতে চাও বলো?

জলার ওদিক থেকে ফের কারা উঠে আসে, দেখো
ভাতের সম্বন্ধে কারা ছুটে এলো আতসবাজীর ঋতু রাতে
ঘূমের বাড়ির মত চাঁদ,

বলো, জেগে উঠবে কবে?

কারা শব্দে টলতে টলতে ফিরে যায় অশ্বকার সুড়ঙ্গের দিকে?

হাউই ওড়ানো রাত

আমি কন্সটল রুম থেকে কথা বলে উঠি
হ্যালো, হ্যালো—আজ অগ্নিপরাীক্ষার রাত? কে গো
জেগে আছে? অগ্নিনী, ভরশী, অনুরাধা, স্নাতী
সাদা দাও—কারা ঘুমের ভেতরে জেগে উঠে
সমস্ত গুদোম লুঠ করে নিয়ে যায় দেখি
মাঘের রাত্তিরে কারা ফের উনুন জ্বালায়
গোল হয়ে বসে আগুনের চারপাশে

স্বপ্নের ভোজসভায় পুড়ে যায় অনন্ত হাউই

একবার শূন্য একবার, কথা রাখো তুমি, গবেষণা থেকে মুখ তুলে।

ভারউইন সাহেবকে

গাছের সঙ্গে আজ আমার প্রেম

আজ আমার ভালবাসা কালো মেঘের সঙ্গে কিংবা

পূর্বস্মৃতি হাতড়ে আলাপ জমাতে চেষ্টা করি
পিঁপড়ে আর ঘাসফড়িঙের সঙ্গে

নুড়ি, শব্দ ইত্যাদি আমাকে মনে করিয়ে দেয়
নোনোগন্ধ, বৃন্দবৃন্দ আর আঁশজন্মের কথা

ব্যাঙ, সাপ, পাখি পেরিয়ে যেখানে ছোট্ট ঘোড়া
উদ্ধত সিংহের গপ্পো শব্দ হয়, সেখানেই তেজ ও বিক্রম

এরপর শব্দ, বৃদ্ধ, দামামা, ক্রোধ, রক্তপাতের কাহিনী
ওলটাতে ওলটাতে থমকে যাই বিস্ফোরণের শব্দে

ধূসর ছায়ার নীচে ফেলে পালাই পোড়া মাঠ, দীর্ঘশ্বাস
নক্ষত্র আর অশরীরী ইতিহাস—

তারপর কোন এক ঝলমলে পূর্ণিমার রাতে
কচিঘাস বেড়ে উঠবে অন্য এক গ্রহে, বেজে উঠবে গান

আলোর নীচে আবার উড়তে থাকবে লক্ষ্মীপেঁচা, শ্যামাপোকাকার দল
আবার দেখা হবে ছন্দবেশে, তোমার আমার, হে ভারউইন সাহেব।

বিনিময়

লম্বা টানা বারান্দায় দৃ-একটা শূন্যকনো মৃৎ প্রতীক্ষার

মেয়েটা ট্রলির ওপর কাঁপছে এদিকে

পিঁপারিটের গন্ধে ঘুম নেমে আসতে চায় তার দুইচোখে
আর দন্তানা গিলিয়ে নেয় তিনজন গাউন পরা যাক

নীচে, রাস্তার ওপরে

একটা কাঁচাকা গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে
জুকে উঠে ফের সামলে নেয় নিজেদের কিছু মানুষ-মানুষী
তোড়াবাঁধা ফুল, ধূপ, নামাবলী, খই আর খচরোর
ছড়িয়ে যায় শান্তিকলাপ

ফুটন্ত গরম জল, সিরিঞ্জ ও ছুঁত

মুখের ওপরে গোল আলো, বিন্দু বিন্দু ঘাস
মেয়েটা কাঁপছে ঝড়ে, দুমড়ে যাচ্ছে ভালপালা
জীবন্ত কান্নার শব্দে শেষে হাস করে ছেড়ে দেয় নীচে
সেই কাঁচাকা গাড়ি।

ছোট পরমাণু

দেশো এরই তেজে ক্যাসার হাসপাতাল থেকে লোকটা ফিরে গেল হাসিমুখে
আর অন্যদিকে সামুদ্রিক ধ্বীপে হয়ে বিকলাঙ্গ হল হাজার মানুষ

ছোট মল্ল

দেশো এরই বাবহারে জেগে দুর্ভিক্ষপীড়িত গ্রামে, হাসি
বাড়তে বাড়তে ফের অন্যদিকে জমা হয় চাপা ভয়, আশংকার রাত

ছোট অক্ষর

দেশো তুমি তুলে আনতে পারো প্রেম কিংবা বিশ্বাসের ছবি
অথবা ঘুরিয়ে কথা ছুঁড়ে দিতে পারো বিকটিটা, মদেহের গ্রানি

বলো, বলো কিভাবে জানাতে চাও বলো তুমি এই সন্ধিক্ষণে ?

দীপ চৌধুরী

চেনা অচেনার ভিড়

সমুদ্র বালিতে বিছিয়ে যায়

চেনা অচেনা মৃৎ, মৃত চোখ, শামুক ;

এরা বারবার এসে ফিরে যায়—

চেনা অচেনা তারা সাহস পায় না

বিরক্ত করতে বাঁচার এই গম্ভীর ব্যবসা ।

কোনো চুড়ান্ত ট্রাজেডি নেই

আছে শুধু অবিরাম বর্ণপে রাস্তায় ক্ষত ;

প্রলেপের পর প্রলেপ ধূয়ে সেই

বেরিয়ে পড়ে সারি সারি শবের মত

পাথর, মৃত চোখ, শামুক, চেনা অচেনার ভিড় ।

মা

ছেলের আমার কাঁথা দুই—কাজলকালো চোখ

গুন গুন গান গাই—আহা মায়ার ঠাসা রাত

স্বামীীর আমার ভাত বাড়ি

জল নিকিয়ে মাদুর বিছিয়ে

বড়ো মাছটা সেই থায়

সোহাগ ছলাং অল্লজোড়া

চেটে ছলাং চোখের দোলায়

শুনোছিলাম বটে মাঠ পার হয়ে

এ পাশ ও পাশ এ গাঁয়ে গাঁয়ে

সব পেছনে ফেলে বড়ো মাগর

সেখানে নাকি বালি ওড়ে নৌকা কাঁপে শব্দ শব্দ

ও মা শুনোও বুঝি বুঝি দাপায়

কি সম্বোধনা—

ছেলে বেঁচে থাক—সোনা সোনা

স্বামীী মাহের মাথা থাক—পুস্‌মান্দুস

সোহাগ ছলাং অল্লজোড়া

চেটে ছলাং চোখের দোলায়

মেয়েমানুষের কোলজোড়া ঘন

আর কি ঘনে প্রয়োজন তার

আহা মায়ার ঠাসা রাত

আমার মায়ার গড়া দিন ।

ছেলে

তবু বালি ওকে তুমি বনবাসেই দাও

বাবারা সব মরে যায় পটাপট

মায়েরা আঁচল লুটিয়ে হুটোপুটি থায়
 পাড়া প্রতিবেশী ডুকরে ওঠে
 হা রাম তুমি কোথায়
 দোষের কিছ্ নেই
 আহা ছেলে আমার চোখের মণি
 আহা মেয়ে আমার হৃদয়ের ঘন
 বিপর্ষয় যদি ঘটে
 যখন ছেলে প্রস্তুত সিংহাসনে বসার জন্য
 তার শুল্কের গাড়ী খেলার সাথী
 রাজা মেয়ের রাজ্য চুলের ফিতে
 সবই ঘরে আছে
 সবই ঘরে মজুত
 ঘণ্টা বাজলো ঘণ্টা থামলো
 ছেলে আমার ঘরে এলো না আর
 জনঅরণ্যে যতগুলো বন্ধু
 দূরে দূরে যতগুলো বাবা-মা ছাড়িয়ে আছে
 ঘণ্টাধ্বনির পাহাড়ী ঘনতায় শব্দ করবে

‘মা তুমি শোক করো শোক
 এ এক মহাশোকের কাল’

তবু বলি মাগো ছেলেকে তুমি বনবাসেই দাও।

মা

শীতকাল কেটে গেছে কবে
 এখন বসন্তের মাকামারি
 সবসময়ই দেখি
 কেমন বেন কঁকড়ে ছোটোখাটো হয়ে
 শূন্যে থাকে আমার মা
 এখনও নীচে চিক্‌চিক্‌ কাগজ পাতে

ভাঙা রিক্সার টেনে আনা গদি
 তার উপর ছেঁড়াখোঁড়া কাপড়ের পটলী
 হাঁ করে মায়ের মূখের দিকে চেয়ে থাকি
 মা আমার মূখ উপকে
 আমার চোখ উপকে
 বড়ো রাস্তায় ঘড় ঘড় করে ট্রাম চলে
 সেদিকে হাত পেতে বসে থাকে
 তারপর কঁকড়োতে কঁকড়োতে
 ঐ মাটা কপ করে মরে গেলো একদিন

মায়ের মূখের দিকে চেয়ে থাকতাম
 মূখটা নেই
 আমার মূখটা অন্যদিকে ফেরালাম
 আরো অনেক
 আরো বিছানা
 আরো ফুটপাথ

সব মাগলো ছেলেগুলোকে বৃকে চেটে
 তবু
 তাদের চোখ উপকে
 তাদের মূখ উপকে
 বড়ো রাস্তায় ঘড় ঘড় করে জীবন চলে
 সেদিকেই হাত পেতে বসে থাকে।

মোটামরফিসস্

বাকের মাঝে জোনাকির চমক।
কাঠের নীচেট সোফাটা হঠাৎই
শাদা মেঘের মতো পেলব।
ভুলোর মধ্যে এক ধরনের নাচ হয়।
ঐ নাচের তাল পৃথিবীর কাছে
জন্মের সময় থেকেই পাওয়া।
ঘরের দেওয়ালে জীবনমিছিলের
চালচিত্র আসর জম উঠেছে।
এখন বাতাসে ছুব সঁতারের ক্ষণ।
পৃথিবী বলতে পারবে না যে
তার ছেলেমেয়েরা বেরসিক।

কুরচী ফুলের গন্ধ

আজ মাঘীপূর্ণিমা। রাত অনেক।
এমন রাতে ঘুম হরতাল করে মাঝে মাঝে।
জ্যোৎস্না বলকে বলকে
উথলে পড়ে। নিশ্চন্দ্রদীপ শান্তিনিকেতন।
আমরা বাগানে বসে। ঘর আজ কোথায়?
বাতাস কুরচী ফুলের গন্ধে নিসাড়
রাতের ক্যানভাসে শাদা ফুলদের শোলার কাজ
চেষ্টাকার লাগে। যে কথা বলি বলি করে
আজও না বলা তা কি এখনই বলা
যেতো না? সবসময় বোবা।
আমাদের পলক পড়লো না, শ্বাস
বইলো না, কথা সরলো না।
আমরা যেন বরাবর এমন মূর্তির মতো।

পাথরে ফটিক জল

দিনগত পাপক্ষয়
ক্ষয়োগ ছুটে চলে অক্ষয়ের দিকে, তবু
দিনগত পাপক্ষয়, তবু
রূপকথা মুখ ঢেকে ছুটে চলে অরূপের দিকে।

ভুরিভোজ, মৃৎশৃঙ্গি
জিহ্বায় কবাটে শব্দ রেখে যায়
আমলকী, হস্তামলকী—
কথা শব্দ জল-পানে আচমনে মধু হতে চায়, তবু
জল কই, জল এখন ভারবাহী জীব,
লগনসার ভরা ডিঙি টেনে নিয়ে যায়,
জল নেই, তিস্তায় ঘোর নাগরদোলা
মেলার হাজাক নেভে, ছেঁড়া-খোঁড়া ঘাস, তবু
পাথরে ফটিক জল, পাথর জলের দিকে ছুটে ছুটে চলে।

কবিতা ও চাঁদ

লোড-শেডিংয়ে চাঁদের আলো
আবার কবিতা হাতে গড়ে দিয়ে গেল।
এই চাঁদ কখনো দিগন্তে তামা, মৃণালভ,
কখনো মেঘের ফাঁকে, কখনো ধাতব রূপো-নীসে।
এই চাঁদ জোয়ার-ভাটার মতো শব্দ নিয়ে স্বেচ্ছাচারী,
ডাঙা-জল একাকার
ময়দানবের যত বিষয়-আশয়।
পৃথিবী-নিড়ানো রস চাঁদের মিশেলে মদ
গাঁজয়ে উঠেছে দিনগত।

আখের ছিবড়ে পড়ে আছে, তাই পানসে মৌতাত।
মাঠেঘাটে খামারে গোলায় চাঁদ ভব,
পাইকারী কল পেতে রাখে,
দু-চারটে কবিতার খুচরো ইন্দুর ধরা পড়ে।

একবারে কেড়ে ফেলে দেব ভেবে চোখ জুলতে দেখি
ধামা-ধরা ফড়ে চাঁদ কবিতার পাওনা নিতে বসে আছে।

বারের পুজো

জলচৌকি আলো ক'রে বসেছেন শনিমহারাজ।
বারকোষে কাটা ফল, সিমি, চালকলা—
ভিড় বাড়ছে, জুতোর ডাই,
বারের পুজো, ভিড় বাড়ছে, গ্রহের ফের কাটাবার ভিড়।

ছাঁচে-ফেলা হাড় গোড়, পরুতমশাই,
হাঁপের টানে পাজরা ঠেলে ওঠে।
ফাঁকে ফাঁকে খেজুরে আলাপ—
শরিকী দোকান লাটে,
এ-লাইনে মোটামুটি চল যাচ্ছে,
চল যায়। কী তাঁকে চালার
ঘরে বিকলাঙ্গ মেয়ে, বাউন্ডুল ছেলে...

শুনতে-শুনতে মনে হয় তোবড়ানো শূখের ভাঁজে
ছুরির দাগ জেগে উঠছে।

পুজো শেষ। পা গুটিয়ে ঢেকেঢ়কে সবাই বসেছে,
শান্তি জল দিতে উঠে দাঁড়ালেন পরুতমশাই,
দাঁড়াতেই তাঁর সারা দেহ নীল হয়ে গেল
শনির মতন।

শান্তি জল

হাত থেকে জলের ফোঁটা পড়ছে না,
গরম রক্তের ছিটে লেগে যাচ্ছে সকলের চোখে-নুখে।

অমিতেশ মাইতি

গতিপথ

কার প্রাপ্য কতটুকু কে বলে দেবে?
যদিও নদী আজো সমুদ্রে অভিলাষী—
সমুদ্রে নিজেই জানে সব নদীই তার প্রাপ্য ছিল না!

নদীকে কে বলে দেবে, সমুদ্রকে কে বলে দেবে?
তবু কার প্রাপ্য কতটুকু যথাযথ জেনে নেওয়া ভাল
নইলে কি লাভ বোলা শূঁধু ফোভে ভেসে?

আমি দুই হাত-পা রক্তমাংসের পাপপুণ্যের প্রবল পুরুষ
আমার অধিকার, মাটি ও মাংসের প্রাপ্য বুঝে নিতে চাই,
আজ সব নদী নিষিচারে সমুদ্রে যাবে না

কেউ কেউ বাঁধ ভাঙবে সশব্দে, ভাঙবে বোবা ধৈর্য ও হৃদয়।

নদীর ধারে

নদীর ধারে খেলছি, ডেউয়ে দুলছে নৌকো
মুখের ওপর রোদ ও ছায়া নড়ছে
খেলতে খেলতে জিতছি হারছি ধামাছি...

মা ডাকলো, আর
বাবা আগেই ছিল
ভাই গেছে তা অনেকদিন হলো
ছিপ ও বজরা ভাসছে দরিয়ায়

মাথার ওপর খোলা আকাশ, হা-হা হাওয়া হাসছে
বটের নিচে জাগছে চিতা-কাঠ
সন্ধ্যাপনে কারা এখন ডাকছে!

মা বললো, ভয় করিস না আর...

নির্মাণ

একান্নটি পীঠস্থান থেকে মাটি এনে তোমাকে সাজাবো
তেমন ভেব না

সময়ের নেগেটিভ দেখে, শব্দ খড় দিয়ে জড়ানো প্যাচানো
এই কংকাল করোটি
ইচ্ছে করেই—চোখের গর্ত দূটো বোজাবার চেষ্টা করিনি

এ ভাবেই রেখে দেব, দেখে যাও কী হাল হয়েছে!
যদি বৃষ্টি দাও—গড়ে দেব মাটির শরীর
যদি ঘর দাও—রঙ দেব, পোশাক আশাক গয়না
সম্মান দিলে—প্রাণ দেব আমি

একান্নটি পীঠস্থান থেকে মাটি এনে তোমাকে সাজাবো
তেমন ভেব না
যদি স্বপ্ন দাও—তবে চক্ষুদান।

দৃঃখ

কপাল জুড়ে দৃঃখে যখন দখল নিয়েছে
হাটতে হবে চৈত্রেয় ক্ষেত্রে মতো হা করা পায়
কচ্ছপের পিঠের মতো চিহ্নিত মাঠের উপর।

চোখ যখন ব্যাপসাময় দৃঃখ-ঘোড়ার ক্ষুরের উড়ন্ত ধূলোয়,
ডিসেম্বরের ফুল-মানহালির হাওয়া যখন জীবনময়
সূর্যের অপেক্ষায় অলস দিন ব্যাপনের কি প্রয়োজন!

দৃঃখে যখন জড়িয়ে আছে কপাল লাউগার মতো
হেঁটে যাওয়া ভালো অশ্বকারেরই ভিতর :
অশ্বকারের উজান বেয়ে যদি
একদিন ফুটে ওঠে কপাল জুড়ে কঞ্চচূড়া রোদ।

সোজাপথে তারপর

কিছুদিন কেঁড়াতে যাচ্ছে? ভুলপথে? যাও...
বাঁধা পথে হেঁটে হেঁটে তেঁটে বড় বিবমিষা—
বড় মাকড়সার ভিড় ওপথের কোণে ঝাঁজে—
তার চেয়ে ভুল পথে ঘুরে আসা যাক—
কোনো কোনো দিন।

ভুলও পথও একদিন কলসি উঠে দেবে
ক্রান্তিকর ঘাম—
তখন কপালের ঘাম মূছে ফের সোজা পথে
না হয় এসোই নেমে দীর্ঘ লাজুক পায় পায়
দ্রুতপথ সকলেই খোঁজে—কে না তাহা জানে?

ভুল পথে ঘোরাল হলে,—বার্ষ্য হলে কিছুটা সময়—
ফিরে এসো এই সোজা পথে ॥

সহবাস

হাজার বছর একসাথে ছিলাম তিনজন,
তুমি, আমি আর শরতান

প্রত্যক্ষ ছিল সৈকি, হাওয়ায় ধুলোয় ঘুণার গুঁড়োর মতো মিশে ছিল
অশ্বকর কোণে কোণে ঝুল হয়ে ছিল

খেয়াল চাপলে কালো আলখাল্লা ঝোলা টাউস হাত
বাদুড়-ডানার মতো দু'লিয়ে দু'লিয়ে আনত ঝড়

আলাদীনের দৈত্য যেন থমথমে মুখে ওমনি দাঁড়াত
খাবার টোঁকলে, বিছানায়, আলো আড়াল করে

সেই শয়তানের সময়ে জিভ ছিঁড়েছিল গুমোঠের নখ,
ছাৎনু ঝড়ে কৈ'পে কৈ'পে দু'মুড়ে মুছেড়ে গেছে মেরুদণ্ড

কাঁপতে কাঁপতে কঁকড়ে মুকড়ে দলা পাকিয়ে
অভিকার কেবোর মতো জরদগব কুণ্ডলী দু'টো

রক্তে ঘামে ঘুণায় মাখমাখি
ভুলে গেছি কোনোদিন মানুষ ছিলাম

কোনোদিন দু'চোখে উত্তাপ ছিল, ভালবাসা ছিল, ছিল বাড়িয়ে দেবার
মতো হাত
কোনোদিন আমরাও আলোর দু'চোখে রেখেছি পলকহীন চোখ।

বৈশিদিন, বড় বৈশিদিন শয়তানের সঙ্গে থেকেছি দু'জন,
এখন আর শয়তানকে দায়ী করে লাভ নেই।

স্মৃতিপট

গ্যাসচেন্বারের পথে রিহুদী ছেলের মুখে স্বর্ণবিভা,
সে মোরেটি নেই;
কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে মানুষের জাল ছিঁড়ে ল্যাম্পশেড জ্বললে,
রাত জেগে ভালবাসা লেখা হয়;

তবু আজ সন্ধ্যাবেলা ধোয়াভরা আকাশের
আবিলতা তোমার দু'চোখে
ভালবাসা কতই সহজে ক্লান্ত হয়,
ধুলোয় মেচেতা পড়ে প্রিয়তম মুখে,
চুলে পাক ধরে।

আমাদের জন্য কোনওকথা ঘোর দুঃখে নেই
শান দিয়ে ধারাল উজ্জ্বল করে নেব ভালবাসা
অজ্ঞালিতে নিবেদন নেই,
হিসেবের কর গুনি;

দিনে দিনে আমাদের ভালবাসা ভোঁতা হয়ে যায়, আর
কাঙালের মতো
ভালবাসা ভালবাসা বলে হাত পেতে বসে থাকি,

এমনিভাবেই,
কতই সহজে,
ভুলে যাই ভালবাসা কথাটার মানে।

‘সারারাত দক্ষবনে সূর্যের তপস্তা’

সুজিত সরকার

উমিলা চক্রবর্তী বহু পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে লেখেন না। বিশিষ্ট কিছু লিটল্‌ ম্যাগাজিনেই তাঁর কবিতা লক্ষ্য করা যায়। তাঁর কবিতা পড়ে বোঝা যায় তিনি আঙ্গিকসচেতন, তাঁর উচ্চারণ মাজিত, তাঁর মনন পরিণীলিত। মোট কথা, তিনি একজন শিক্ষিত কবি। ‘খোঁড়াদের রাজ্যপাট’ সম্ভবত তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। সুসূদ্রিত, পারিচ্ছন্ন, নয়নরঞ্জন ছাপাম পাতার এই কাব্যগ্রন্থটি দুটি পর্বে বিভক্ত—‘কিছুটা মানুষ’ ও ‘পারিপার্শ্বিক শূন্যতা ও ল্যাজারাস’।

গ্রন্থের নাম ‘খোঁড়াদের রাজ্যপাট’ কেন?—এই জিজ্ঞাসা নিয়ে পড়তে শুরু করি। প্রথম পাঠে দুটি প্রশ্ন জেগে ওঠে অর্থহীন প্রশ্নের ভিতরে প্রশ্ন। (ক) ‘সারারাত / দক্ষবনে সূর্যের তপস্তা’—‘দক্ষবন’ কেন? (খ) ‘ওদের পুতুলই চাই / অথচ এখানে / কিছুটা মানুষ মেলো, / বাকিটা পাথর’—‘এখানে’ মানে কোন্‌খানে? প্রশ্ন দুটির সম্ভাব্য উত্তর পেয়ে যাই অন্যান্য কবিতা থেকে। যেমন, ‘ছানিপড়া চিনিগলগো / জোয়ান ছেলের খোঁজে / হোঁচট রাস্তার’ কারণ, জোয়ান ছেলেরা সব হারিয়ে গেছে ‘ভাঙাচোরা আধার রাস্তার’। এরাই পাশাপাশি যখন কয়েকটি কবিতার নাম দেখে ‘বার্থ’ বিপ্লব ও প্রয়োজনীয় হাড়িকাট সজ্ঞাস্ত, ‘বিদ্রোহ’, ‘প্রতিবাদ’—তখন বুঝতে অসুবিধে হয় না আগুনের প্রতীকে আসলে এক আন্দোলনের কথাই বলা হয়েছে যে আন্দোলন বার্থ হয়েছে এবং যে আন্দোলনে বহু যুবকের অকাল মৃত্যু ঘটেছে। ‘দক্ষবনের’ অর্থ এবার স্পষ্ট হয়ে আসে নিজের কাছে। আরো স্পষ্ট হয়ে যায়, যখন, রক্তের পরিবর্তে কবি ‘আগুন’ কথাটি ব্যবহার করেন: ‘ফিনিক দিয়ে গড়িয়ে এল আগুন’। ‘এখানের’ অর্থও স্পষ্ট হয়ে ওঠে অন্য দুটি কবিতা থেকে: (১) ‘এখানে থরায় / অন্য মেয়ে মাটি কাটে’ (২) ‘জলজঙ্গলের মেয়ে...এখানে এসেছো কেন, ফিরে যাও। / এখানে মাটির বুকে খরা, / অবসর খড়েরা ঘাড় গুঁজে পুরনো বর্গার / নত স্বপ্নে লীন’।

এইভাবে প্রতীক ও চিত্রকল্পের রহস্য পেরিয়ে এসে, প্রথম পাঠে, গ্রন্থটি বেশ কিছুটা স্পষ্ট হয়ে আসে। কিন্তু পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। তাই, দ্বিতীয় পাঠ শুরু করি। এবারও একটি প্রশ্ন মনে জেগে ওঠে। যে সূর্যের জন্যে কবির তপস্তা, সেই সূর্যকে কবি অন্য একটি কবিতায় ‘সহানু-ভূতিবিহীন’ বললেন কেন? কবিতাগুলির আরো ভিতরে গিয়ে এই প্রশ্নটিরও সম্ভাব্য উত্তর পেয়ে যাই। বুঝতে পারি, যে সূর্যের জন্যে কবির তপস্তা—সেই সূর্য ও ‘সহানু-ভূতিবিহীন’ সূর্য এক নয়। বিপ্লব যেখানে বার্থ হয়েছে, স্বপ্ন যেখানে নষ্ট হয়েছে, অসংখ্য যুবকের রক্তে যেখানে মাটি ভিজ়ে গেছে, সেখানে দাঁড়িয়ে সূর্যকে তাই ‘সহানু-ভূতিবিহীন’ মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু যে সূর্য নিয়ে আসে এক নতুন প্রভাত, যে সূর্য মঙ্গলময়তার প্রতীক, যার আলোয় ‘নব আনন্দে’ মানুষ আবার জেগে ওঠে, সেই সূর্যই কবির কাঙ্ক্ষিত, আর তাই, ‘দক্ষবনে’ সেই সূর্যেরই ‘তপস্তা’। হয়তো এই কারণেই ‘উত্তরণ-১’ কবিতায় কবিকে বলতে শুনি: ‘রাতের মোহানা বেয়ে / পরিচ্ছন্ন সূন্দর সকালে / উত্তরণ লক্ষ্য ছিল’। সূর্যের মতো একইভাবে, এই কাব্যগ্রন্থে, ‘আগুনও’ দুটি বিপরীত অর্থ বহন করে—যে আগুন শমনে শমনে নাচে, সেই আগুনকে কবির ‘পিশাচ’ মনে হয়, অথচ কবির কাঙ্ক্ষিত অন্য এক আগুন: ‘কোথা বাকি অস্তিম পাবক / কোথা শক্তি নতুন জীবন’। তাই, বিপ্লব বার্থ হলেও, বিশ্বাস-আজো অটু: ‘কুণ্ডলী পাকিয়ে অশ্বকারণে পাহারায়, / একা গর্তে মগ্ন আগলানি’।

এইভাবে, দ্বিতীয় পাঠের পর, প্রথম ও প্রধান প্রশ্নেরও উত্তর পেয়ে যাই। বুঝতে পারি, ‘খোঁড়াদের রাজ্যপাট’—এই নামকরণ, আক্ষরিক অর্থে নয়, প্রতীকী অর্থেই আমাদের গ্রহণ করতে হবে, কারণ, এই রাজ্যের সবাই হয়তো শারীরিকভাবে খন্ন নয়, কিন্তু মানসিকভাবে খন্ন, যেহেতু এখানে ‘আমাদের স্বপ্নের মুখে ছেঁবে যাচ্ছে কালি’, ‘প্রশ্ন করবার সাহস আমাদের নেই’, যেহেতু এখানে আমাদের ‘তোবাড়ানো আকাঙ্ক্ষাগলো বোনোজলে পুরনো কৌটোর মতো / টাল যায়’।

খোঁড়াদের রাজ্যপাট: উমিলা চক্রবর্তী
উল্লেখ্য, ৫৩/১১ ঘর্ষিতা লেন, হাওড়া-৭১১ ১০২
মূল্য: আট টাকা

প্রতিবিম্ব

কর্ণজলে ভাসে তারা !

শেষরাতে উঠে আসে, গন্ধ নেই

তাই ঘাসে ঘুমিয়ে রয়েছে ।

সারাদেহে আলোকিত ফেনা

বুকে নম্র, সঞ্চবন্ধ মাছ

স্বপ্নে আছি, জাগরণে আছি ।

তাদেরও গভীর গৃহা ভ'রে আছে মদে ;

প্রকৃত হৃদয়ে রয়েছে জ্যোৎস্না

শিবেপ, শয্যালয়ে ।

কতোদিন পরে এলে

অঞ্চ চিনি না যেন, প্রতিবিম্ব ভেবে

ভুল করি !

রূপা দাশগুপ্ত

জলজ উদ্ভিদ

পরিচিত জানলার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার ঘুম পায় ।
আমি ভাড়া করা সানাইয়ের মৃৎ দেখতে চেষ্টা করি । আর, সেইসব
শুকনো পাতার দুলে থাকা বারা হাওয়ার কাছে হাতজোড় । শূন্য
থেকে ধুলে পড়ে ঈদমার্ক শাদা ধূতিটি । তাকে বেলুন নাকি বাহার
বলবো ভাবতে ভাবতে ভেকে আনি সমুদ্র । আর আমার খুব ঘুম
পায়...ততো ঘুমে খাবলে ধরি জলজ উদ্ভিদ ।

বিশ্বাস

আমি বিশ্বাস করি কোন একদিন তুমিও

এ লেখাটা পড়বে ।

এটুকু বিশ্বাস সাধারণতঃ

একটা পাথকেও করা চলে

জানো, আমারও মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যায়—

এলোমেলো ।

তোমায় যেই মনে পড়ে ;

সব ভেসে যায় মোহনার দিকে

আমি পায়ু ভাঙার শব্দ পাই ॥

মৃদুপ বসু

দুঃখ

দুঃখ কি তোমারই শূন্য চরাচরহীন ?

আকাশেও দুঃখ নেই ? রাস্তাবিহীন

গোধূলি-বিহানে কদে ; মরমী ব্যাভাস হয় ভারী—

দুঃখ তো মাটিরই কন্যা, শৈশবে চেনা কোনো নারী ।

সুখী অবয়বগুলো দেখেছো কি ? অলস সে অগভীর মৃৎ—

দুঃখ-ই সবজ করে ঘাসফুল—মাঝেমাঝে বিন্দু বিন্দু সূঁচ ॥

তাও তো কলঙ্কগুস্ত জ্যোৎস্নার প্রচার
চাঁদ নয়,
ঘোলা হতে দেখেছি বারবার চাঁদের আঁধার।

দীর্ঘ আলিঙ্গন থেকে বিচ্যুত প্রেমিকেরা
ওখানে সমস্তরাত পোড়
আমি চেয়ে চেয়ে দেখি পরিদ্রাঘহীন খেলা
কখনও ছুঁই না।

শ্রীমলবরণ সাহা

দুঃখ

আজ আমার চোখের লবণ থেকে
ঝরে পড়ে মরিচা সময়...
প্রস্থান চরণে কাঁপে প্রান্তিক আগুন!

ভালো আছি, ভালো নেই
বাতাসে গৌতম শোক, পুরুষের ক্ষয়
মাঘ মৃকুলের সাথে করে...

ছোট-বছোট ঘুমের আঁধারে
আজ শুধু শরশয্যার পাহারা
মরণে পড়া লোহার পুরুষ!

প্রণয় পাল্কি

চলেছে প্রণয়-পাল্কি।
রক্ত আছে, মাস আছে তার;
চতুর্দিকে কাদার শিল্প
আজ অনন্তলোকের কথা ভাবো।

এক চামচ জল জিতে ধরে রেখে
শুরু করি আশ্চর্য এ গান;
বাতাসে ভাসছে একদমল শ্রেষ্ঠ মামুড়ি
আর দূরে অন্তঃসত্ত্বাদের কালো চুলের বোরখা

গর্তে গর্তে তুলো গোঁজা।
খ্যাতলানো হারিণের মলমল;
সারারাত ধরে যে ডিমগুলো পুরুরের
জলে ভেসেছে—ঐ তার শূন্যতার ভিতর

একটি ডানা; অন্ধকার। বড়ো কাশির শব্দ আসছে,
কে যেন হাঁফের টান দিয়ে রাত্রিকে পুজো করছে;
কার বিবাহ? চোখ নেই, কার বিবাহ?
একচক্ষু বিড়ালের পায়ে জ্যোৎস্না লেগেছে।

মুখের ভিতর সহস্র সংকট। কুম্ভমেলা থেকে নিজের গ্রামের বটগাছে
লাফ দিয়ে ফিরে এসে, পক্ষীমাতার বন্য বাংলার রহস্যময় দুখে ফলে
জুবে পাওয়া যায় সেই ধানখেত সেই সর্বাং-প্রবাহ। কি অম্লভূত সব
ব্যাপার। দ্বিতীয় জন্ম। কালো সাপ গলায় বেঁধে অস্বহতার শ্বেত;
মাংসের লোহার পাত; তার উপর দিয়ে আকাশের দিকে ছুটে যাচ্ছে
একটি ঘাসের টেন। শাড়ির পলিমাটি থেকে পদ্মসাবানের দেশ উঠিক

মারছে। অসুস্থ মুরগির ঠোঁটে সাহস। আলোর শূক্কাগুনা ক্ষুধার্ত।
প্রথম বাচ্চা না হবার ক্ষুধা দিয়ে তৈরী এই পালকি। পালকির
সঙ্গে চলে আটটি খল

দুই তীরে কাদা; প্রাবণ-সেঘের মধ্যে দেখা যায় শ্যামপতঙ্গ। পানের
বোটা ভাসছে জলে। আলোর এই কথা স্বীকৃত। ধীরে ধীরে ডালপালা
জুড়ে প্রতিধ্বনি শব্দ হয়। নখের পতাকা ঘুম থেকে উঠেই ধ্রুব
আধারকে আঘাত করে। ঝঞ্ঝার। পল্লীর ঘাটে পা ধোবার জলে কৃত
অপরাধ; ভারতী-মাতা, তার অখিল দুঃখের ঘড়া। এই অসহ্য ব্রহ্মাণ্ড
ক্রমে আচ্ছাদিত হয় শ্যাওলার অজস্র প্রবাহে। হৃৎপিণ্ড ছুটে যায় সমুদ্রকে
হারমোনিয়ামের মতো বাজাবে বলে; মড়া পেছন থেকে এসে পুত
অগ্নিস্বরে কীর্তন শোনে। কোটের মধ্যে কুঙ্ক। থোকায় থোকায় চাল
ফুটে উঠছে

গম্ভীর উন্মোদিত দিবাজীবন ফুটে ওঠে।

সূর্য মাটির দেওয়াল দিয়ে ঘেরা
এই ইন্ডিয়ালোক; বেঁচে থাকার নামে
কীর্তন চলে সারা দিনরাত।

ধারালো রাতি মেলে দেওয়া শাড়ির মতন
এক সময় শূন্যে আসে;
মাটির ফুলদানি থেকে গড়িয়ে আসছে
মেঘেরা, অতীতের হিজিবিজি খেলাঘর।

বালিকার বিনাশ। বস্ত্রের শেষ বিড়ালের লোম
উড়ছে। প্রসারিত তরঙ্গ চেতনা;
মাকড়শার জালের ভেতর মোহের প্রণাম।
বন্ধির নক্ষত্রসকল ছাই মূখে তোলে;

অসীমের শূন্য থেকে অক্লান্ত আঘাত।

নিসর্গের উত্তেজক মারি—সেও

ভাতের দানাগুলো দেখতে পায়; আর বলে

বাংলাদেশের মেয়েদের স্বেচ্ছিত হোক। তাদের নাম হোক স্বেচ্ছিত-কুমুদ

অন্তর্ভেদনা; সুভ্রুদের শেষ জোনাকিরা নিভতে নিভতে জ্বলে ওঠে
আবার। একদিকে কলংক-পর্বত, অন্যদিকে ঘুমপর্বত। কলংক দিচ্ছে
নৈশবাদের হাতা খুঁটি সাদাশী। সুপুত্রীগাছের পাতার হাফাকার করছে
মায়ের নাভি; তন্ত্রনখ—যার হিঁজ থাবা ইন্দ্রের ভক্ত—সে উন্মোদিত ছাই
খোঁচানোর মতো খুঁটিয়ে চলেছে আভ্যন্তরীণ মূর্ত্ত রূপকে; বর্ষার জলে ও
বাতাসে পুরোনো মেয়েমানুষদের পায়ের শব্দ হয়। ডাঙা নেই, পা
নেই। বঁড়িশর টোপ মূখে নিয়ে বোকা যায় এই হোলো প্রকৃতকালের
আবহসঙ্গীত; মায়াভাল ধরে কাছে আসে হারিণের ছানাগুলি। আকাশের
ছোটো ঘরে রানী মৌচাক। সঙ্ঘবন্ধ মৌচাক। ক্রমে প্রণয়-পালকির
ভেতর কমে আসে ধর্মলিপ্তনের তাপ। আর কিছুর হারিকেনের মানব;
তারা তেল খোঁজে আবার জ্বলবে বলে।

লতাগাছ উঠছে উপরের দিকে। সেই লতা ওষুধ, সেই লতা অবলম্বন।
সব কিছুর খাবার পর পেটের ভেতর থেকে গলগল করে ঝরে পড়তে
থাকলো বাসী বরফের নদী। একটি বিশাল মাঠ; তার চারপাশে উষ্ণার
মতো খসে পড়ছে গাছের বাকল—লাউকল—কফোঁটা অব্যবহৃত মধুরস।
গণিকালয়ের চাদরের উপর ঢেলে দেওয়া হয় ভাত। তার ওপর কতো
মাছি। হারি, দিন তো গেলে, সন্ধ্যা হলো। পার করা। এই সেই
অনন্ত যাত্রা, যাত্রা—যেখানে দৌড়ে আত্মা হয় সর্বভুক্ত সর্বো ভূত। মাতৃ
দেহ; তাহলে তুমিই হলো দেশের কী হবে? সমুদ্র-ভন; আর কত
দিন পিঠে নেবে নক্ষত্রবেদনা, তার ছাই। তালপাখার মাখখানে
ছায়াময় সকালের কম্পন। দূর থেকে দেখা যায়, গলায় দড়ি দিয়ে
ঝুলছে প্রণয়-পালকির নারী; কুমার-বিনাশ

রোগা মোরগের পালক দিয়ে তৈরী
এ জঙ্ঘল; এখানে ঝলসে ওঠে
দেবীর অস্তবসি। বিষের সাবান।
আকাশে বিদায় বেলার ধ্বনি;

বুনো দুর্যোধ জন্মুরা এসে পড়েছে।
চোখের মণিতে শ্রাবণ মাসের ছাই;
নিতি নিতি শৃগাল সিংহ সনে জুঝে;
বিচিত্র এক ভাষার ক্ষরণ।

এসকল থেকে সরে এসেছে
চাঁদের চরণ। প্রাঙ্গন মাৎস্নহের পাপড়িগুলি
ডাকে। আত্মার ভিতর এক বার্থ চাষ
শুরু হোলো। আর তাই চাষের শেষে চাষা

দেখতে পাই কচ্ছপের পিঠে গড়ে ওঠা ঘর।
নড়ছে। পালিত সাপ ঝাঁপ নাড়ায়।
ক্ষুধার্ত সিঁদুর ছুটে আসে; ভিতরে
ইন্দ্রপ্রস্তমতী; শূন্যের সৌরক্রিয়ায় সে প্রভুপত্নী

আকাশে প্রতিভা; দেওয়ালগুলি একসঙ্গে বেজে ওঠে; হারমোনিয়ামের
একটি ভাঙা রীডে গুপ্ত রোগ। বহু গ্রন্থ রক্তকণার মতো। এ সকলের
ভিতর রাসের যে স্রোত নেমে এসেছে, তার কথা বলো। দোলনার
দোল যেন খেমে না যায়; নব রঙ্গালয়ের মথ—তার প্রাকৃতিক সম্পদ
আর মহাজাগতিক একটি ঘর। রোগে ভুগে সব শেষ। যা নেই, আজ
তাই দাও। রোগা কংকাল, তুমি হয়ে ওঠো নিশি কামদেব। পুং দত্ত,
আজ রাতে আসবে সেই প্রেগের পরী। তার করতলে থাকবে চুন্দা

বড়ো আঠালো এই চর। চারঘণের সাঁতার কাটার পর কোষের ভেতর
কামড়। নারকালের খোলে জমছে বঙ্গদেশের মধু; দমবন্ধ হয়ে

আসে। বেলো ভাই, পরমাণুভাই, বেলো বোন হাওয়াভাঁত, আর তো
হামাগুড়ি দেওয়া যায় না। পুরোনো পৃথিবী ডানা ঝেড়ে ওড়ায়
ধূলো। মোমাগাছ, জিভগাছ, রতিগাছ, ধনিগাছ। আরো আছে
শিক্ষিতের তালজ্ঞান, গরীব গণিকার ডেউ। আরো কতো সংকার,
প্রতারণা, কুটিল প্রবাহ। মাথার উপর শূন্য দৈব মশারির ছাদ ফুলে ফেঁপে
ওঠে। কুমারীর কপালে পূর্ণবিদ্যার সিঁদুর। ছোট্ট এক কোটোর মধ্য
থেকে বিবাহের রাস্তিগুলি বার হয়ে আসে। মহৎ, কিন্তু বিবাস্ত।
এইরূপে কর্ম হলো শূন্য।

বিশ্বজিৎ কুণ্ড

মোহে

সেদিন বকুলতলার বেড়াতে বেড়াতে
অনেক কথাই
বানভাসি স্রোতের মত আসছিল।

নিমন্ত্রণ পরিবেশে আমি সম্পূর্ণ একাকী,
বিড়বিড় করে উচ্চারণ করি মন্ত্র—
যন্ত্রের নিয়মে
পেরিয়ে যাই শৈশবের ক্রীড়াক্ষেত্র।

আবার পেছন থেকে ডাকে, টেনে রাখে—
আবার ফেরৎ আসি—
বসে পাড়ি অশ্রুকার ঘাসে,
বাতাস কবিতা হয়
শান্ত হয় ক্ষয়িতা
আমায় আবৃত করে
পরিণামদর্শী এক মোহে।

অতিরিক্ত

অতিরিক্ত বলতে

তার চুল থেকে, ভিজে অগ্রাধিত চুল থেকে

দু-এক ফোঁটা জল;

এছাড়া দু'পুড়ে ছিলো

মেঘেদের কালো থাবার নিচে।

একটুও স'রে যায়নি—বুকসেলফ, টেবিল;

শুধু ঘর থেকে ঘরে চ'লে যাওয়ার জন্য

পর্দার আকুল ইশারা।

অশরীরী ফেরিওলাদের সুদূর নির্জন ডাক!

অতিরিক্ত বলতে, স্বপ্নের কথোপকথনে

তার উজ্জ্বল বিন্দু চোখ।

প্রত্যাখ্যান

করোটি ও হাড়গোড়ের ওপর

বসন্তকালীন বৃষ্টি নেমেছে।

কার যাওয়ার কথা ছিলো, হাইওয়ে পার হয়ে

তান্মর্থনীর শহরে?

কার জন্যে শূন্যতম কাপে চা আনার,

ভিজে চুলের অবিন্যাসে চা আনার

কথা ছিলো, করিডোর পার হয়ে।

কার রাশ্রিপোশাক ঘাড় গর্জে শূন্যে আছে!

কার নির্জন মুখভক্তি

আয়নার পেছনের অন্ধকারে?

কার জন্যে খনির অতল থেকে উঠে আসছে

ধারালো ধ্বংসে আকরিক...

দিলীপ ভট্টাচার্য

কী ক'রে বোঝাই

কী ক'রে বোঝাই আমি পৃথ্বী সাহাকে,

'হাসতে মানা নয়'—ট্রাফিক দাঁড়িয়ে

আছে আনন্দের মোড়ে মোড়ে।

কী ক'রে বোঝাই—

দূরভিসম্বি কালো মেঘ সূর্য ঢেকেছে।

আজ জীবনের রাজপথ বড়ো অন্ধকার

অভ্যন্ত প্যারে সতর্ক হাঁট,

হাসতে মানা নয়, কী ক'রে বোঝাই?

এখন জ্যোৎস্নার বিভা দেখেও দেখি না

যে ভাবে আপনি সিঁড়ির লাইট নিভে গেলে

খবে ধীরে সতর্ক ভঙ্গিতে উঠে যান ওপরে।

ভগিতা

যাবো না কক্ষনো শোনো ভগিতার কাছে ;
সবুজ পল্লব ছুঁয়ে নেই কোনোখানে ?
এসব সতর্ক হয়ে নিজেকে বাঁচাতে
জলের ঘূর্ণির নিচে পাকাল সাজালে
উত্তোষোত্তে হাওয়া হাসে উলোচুল মেলে ।
দাঁড়াবার ভিত যদি স্থির থেকে যায়
তবে শ্বলনের ভর ঘুরে চলে বায়ে ।
কক্ষনো যাবো না জেনো ভগিতার পাশে
স্ববিশ্বাস পাকা ছিল হঠাৎ হারালে
দোষ দেবে, গালি দেবে—প্রিয়জন লোকে ।
কাদাজল ঠেলেঠেলে ভাসাবে কোথায়
যাবো না বলিনি ; যাবো, বনানীর দিকে...

চুল

দু'আঙ্গুলের শোণে চেপে এই তো ফেলে দেয়া হ'লো
জামায় হাত মোছা হয়েছে ঠিক,
তবু ঠিক তার পরেই
আবার ঢুকে পড়ে শাদা ভাতের গোলকর্ধার,
ভেসে ওঠে বালতির অতল জল থেকে ।
ভিতরের অনেক জলে ভেসে উঠতেই
শক্ত দু'আঙ্গুলে চেপে রেখে আসি বাইরে
খুব সাবধানে গামছায় মুছি হাত
তবু শূকনো হাত ঝেড়ে
আবার জল ছুঁতেই
জলের স্তরে স্তরে
ঘুরে
ভেসে
কেবলি চ'লে আসে
চ'লে আসে ওপরে ।

অথবা কেবলি একা

বন্ধ দরজার পিছনে দাঁড়িয়ে যে
কেবলি দেখে তোমাকে
অথচ তুমি দ্যাখো না,
তবু, যার দরজা খোলা অথবা বন্ধ রাখায়
তোমার সব কিছুরই এখন হয়তো দারুণ নির্ভরতা,—
দরজা তালা দেয়নি ব'লেই সে ভিতরে আছে

অথবা দরজায় তালা ঝুলেই বাইরে
নার্ক সে থেকেও নেই অথবা না থেকেও আছে
এমন এক দোলাচলের মধ্যে থমকে তুমি ভাবো
দরজার ওই অস্বচ্ছ ঘূলঘূলির পেছনে সত্যিই

কোনো চোখ

আছে অথবা নেই, নার্ক নেই এবং আছেও,
তুমি এমুহুর্তে যে-দরজার সামনে দাঁড়িয়ে
তা এক অথবা অনেক দরজা
যা অনবরতই খুলছে অথবা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে
অথবা কখনোই খুলছে না, থাকছে না বন্ধ তবু,

তেমনি সব দরজার সামনে সারবন্দী তুমি
দাঁড়িয়ে নেই আর আছে

নার্ক তেমন কোনো দরজাই এখানে নেই

এক বা অনেক অবাস্তব দরজার দৃশ্যে
অথচ একই দিকে

দাঁড়িয়ে আছে তুমি আর অন্য একজন
অথবা কেবল একা কেউ,

অথবা কেবল একা কেউ।

আবহাওয়া

ধমপুতুর,
সবুজ আলোর নীচে বসে
লাল সোয়েটার পরে আপনি পাশা খেলছিলেন
আমি আলোয়ান গায়ে
আবহাওয়া অফিস থেকে বেরিয়ে দেখলাম—
বিশ্বাস করুন,
সৌদিন তুবারপাতের যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল
তাই আমি আপনাকে বারণ করেছিলাম।

তাম্পুর ধমপুতুর,
মহাপ্রস্থানের পথে আপনাকে দেখলাম—
ওই শীতে আপনি মশাই
একটা জ্যালাজ্যাতে গুপ্তা পরে—
আপনার সাহস দেখে, কি জানেন
আমি বেশ ঢোলগোবিন্দ হয়ে
তা না না করছিলাম, আর
তাই আপনাকে বলছিলাম
কোনো সতর্কবার্তা নেই।

আপনি হাঁটিছিলেন ধমপুতুর
আর মাঝে মাঝেই
পড়ে যাওয়া নখগুলি খুঁটে বার করছিলেন
রঙিন পোকাগুলিকে
পোকাগুলি খিদেতে ছটফট করছিল—
আপনার মনে পড়ে ধমপুতুর—
আমি আপনাকে পইপই করে বলছিলাম
রাতের তাপমাত্রার কোনো পরিবর্তন হবে না?

আজ এদিন বাদে, জানেন

ধন্যপুস্তুর

আবার আবহাওয়া অফিস থেকে

বোঁয়রে আসছি আমি,

দেখছি কালো কয়লাখনি তুষারাবৃত হয়ে উঠছে—

একটি কুকুর কোলে

আঠেরো ঘণ্টা রাস্তায় দাঁড়িয়ে রয়েছে

বাড়ি ফিরতে পারছি না আমি

দেখছি

পরিবর্তিত তাপমাত্রায়

বিপদসীমা অতিক্রম করে

জল উঠে আসছে

দোতলা, তিনতলা, চারতলার দিকে

প্রেম

আমি সেই নেড়ামাথা ছেলে

যার হাতে গতকাল দুইটি চড়ুই

নীল থেকে নেমে এসে বসতি করেছে

আমি সেই নেড়ামাথা ছেলে

নিকারাগুয়ার মেয়ে মঠো খুলে হাতে

লিখে দিয়ে গেছে তার টেলিফোন নং

আমি সেই নেড়ামাথা ছেলে

ডবল ডেকারে উঠে হাট্টু মূড়ে বসি

কখনো বা বাড়ি ফিরি কখনো ফিরি না

যেদিন ফিরি না আমি নিকারাগুয়াতে

লাল নীল চিঠি ভাসে রাতের আকাশে

অরুণ আচার্য

বর্ণার পাশে

বর্ণা সান্নিধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে করুণ মানুষ

তাকে কেউ বিরক্ত কোর না

জলধারা লুকিয়ে রেখেছে অনন্ত চিৎকার

এখানে কখনো পাথরে রক্ত লেগে ছিলো

হাত পা ছড়িয়ে মরে ছিলো

সংসারের বিপন্ন লোক

পরাজিত লোকটি পা ভুঁবিয়ে বসেছে জলে

জলের ভিতর তার কামার পা'ডুলিপি

জলের ভিতর তবু ফুলের সন্ধান

আঁচলে যাইফুল ফুটিয়ে রেখেছো

পদশব্দে ফিরেছো জ্যোৎস্নাকুমারী

করুণ মানুষ এখানে ঘুমিয়ে রয়েছে

তাকে কেউ বিরক্ত কোর না

বর্ণার পাশে ফুল হয়ে ফুটেছে পাথর

তৈরী থেকো

ডাকলেই সাড়া দিয়ো, তৈরী থেকো।

রাশ্রির মানবগুলো যেখানে জমাট বাঁধে রোদে
সেখানে দাঁড়িয়ে

আর বিস্ফোরক স্বপ্নগুলোকে দহাতের মূঠোর পুরে
বলো : পৃথিবী আমাকে স্পন্দন দাও।

স্মৃতির অহল্যা আজ

নীরব, শীতল, মৃত, কঠিন পাথর হয়ে গেছে
পাথর বৃকেতে শব্দ পিছল ইশারা...

এসময়ে টানটান ধনুর ছিলার মতো
নিজেকে ছিন্ন রেখে
যাতে ব্যর্থতার বিনষ্ট শহর
বোঝে জল দাও, ভূষ্ণতার ওষ্ঠে...

তৈরী থেকো।

অরুণাংশু ভট্টাচার্য

১

তার হাতদুটি, তার জেনারো হাতদুটি
এঁকু সামান্য আলোর
কাদামাটি মেখে এলো—
রমণস্বাসে যেন মধুহিম ঘরের দেয়ার

২

কাল এসেছিল তার কৃষ্ণনীল চিঠি
গোলার্ধে গোলার্ধে সেই খবর রটেছে
বার্তাবহ ছুটে যায় নদী চিরে ফাল—
ছুটেছে সবজি বাঁধ বন্দরে বন্দরে

৩

বার্ধ হলো কানাকানি মাঝরাতে পড়েছে বাজ।

৪

তির্থক চোখে চাপ্তা কতো ভালো ?
কতোখানি রস থাকে তাতে ?
নুড়ো জেলের দেব মূখে
ধোঁয়াগুহ্মে ঢেকে দেব চোখ
যদি মূখ হয়ে থাকি বেশবাস দেখে
স্বপ্নঘরে আগনের সাথে

৫

পড়েছে আগনে ওই অসামান্য মূখ
অসামান্য মূখ শব্দ মানুষের নয়

ওগো স্বর্ণরেখা কোথা প্রকাশিত হও
এসা পোড়ামুখে, ধরো তপ্ত হাতদুটি

৬

কতো ভুল করে ভেবে ফেলি এখানে রয়েছে তাঁক্ষা ফলা
প্রাণভয়ে শ্রথ হয়ে পড়ি :—
অথচ কাছেই, কাছে বলতে রোদ্দুরের আগে
জমে থাকে এত ভুল—
এতো শোক জ্যোৎস্নার, আশেপাশে জমা হয়ে থাকে

৭

সেই বিভা লেগেছে দু'গালে।
তা যেন অনন্তকাল ধরে
ভেসে যায় বাহাদের অসামান্য মুখে
(ওই মুখগুলি শুধু মানষের নয়)
তাহারা কি মুখে মায়া-রূপে ?
তাহারা কি ঈর্ষার অতীত ?

৮

দেশ যদি ভরে যায় ইন্দ্রজালে খুব বিষমভাবে ঝুঁকে পড়ে কেউ
কেননা কৌতুকে তার শরীরের স্বেদ বন্ধ হয়।
তাকে মিথ্যে বলা, ফেরেশ্বাজ বলে তাকে নির্বাসনে দেয়া
আমার সাধ্য নয়। কেননা কখনো ঝড়ে মাতে নাই
চুল তার, মাতে নাই ভুরু—
অথচ আশ্চর্য স্বপ্ন দেখে সে কৌতুকে

৯

যেন চিঠি আসে 'প্রিয়তম, তুমি'—
কতো পূর্ণিমার কথা লেখা
সেই শর্মীবন্ধ, নাগকেশরের রেণু

সেই বিল, বক, আদ্রদলে কামড়

সেই ছন্দ, সেই ফোটোগ্রাফে—

সব ধরা আছে মুখে

শরীরের ছায়ার মতন

১০

অথচ সুন্দর কিন্তু রাস্তিকর নয়।

নজুবা এ পোড়ামুখ দেখাই কী করে ?

১১

লুকাই পোড়ামুখের কান্তি রূপ আমাকে তুলে ধরো—
পর্দা ভোলো, নদীর কাছে যাচ্ছি সরো একটু সরো
চমক ভাঙে সামনে ধু ধু বিজ্ঞাপনী লোকের পালা
সবারই মুখ দৃশ্য তবে লজ্জা কাঁসের মেঘমালা !

খবর

আশঙ্কা সত্য হল, মাটিতে কিসের চিহ্ন
অনুখন মাথব মাথব
আমি আজ নিশ্চয়ই হটিমুড়ে বসি আর দাঁখ
কোন তপোবলে
সুন্দরী ভেলি মাথাই

হয়ত বোঝো না তুমি প্রবাসে রয়েছে
জন্মভূমির সাথে আত্মীয়তা নেই
এখন তো টিনচালে রোদ যদি ফার বা সাবান দাও
জল ও লবণ দেবে

এত ক্লান্ত অথবা বৈভব তুমি স্বদেশে দেখো নি, শূন্য
তুয়া অভিসারক লাগি
ভানুসিংহের কথা মনে আসে,
জোড়াসাঁকো : ২৫-শে বৈশাখ ভোর
গান গাইছে পূবালী দেবনাথ

পুনর্ভব

সারাগায়ে পেপারওয়ার্ট চাপিয়ে রাখি,
কাগজের মতো যদি উড়ে যাই !
হাতের চোটো খুব পাতলা বলে
একটু বাতাস পেলে ওড়ে।
কনুই ধরে টেনে আনি নীচে
শিল-নোড়ার তলায় গুঁজে রাখি।
পা দুটো মাঝে মথোই
ক্রেপ কাগজের রোল হয়ে যায়,
যেখানে সেখানে ওড়ে রঙিন ফিতের মতো।
আমি কোমর পর্যন্ত গুটিয়ে
শক্ত দড়ির পাক দিই,
যেন কোনোভাবে না খোলে হাওয়ায়।
এভাবেই আমি বুক পেট পিঠ মাথা
ভিন্ন ভিন্ন পাথরের নীচে শূইয়ে রেখেছি।
এখন আমার সাদা ঘাসের মতো শরীর।
ভবু পায়ের নীচে আরেকটা পা,
হাতের পাশে আরেকটা হাত জন্মাচ্ছে টের পাই,
রোদ আর আলো থেকে
ক্লোরোফিল শূন্যে নেবে বলে।

শ্রাণ

শীতের দিনের মতো দৈর্ঘ্য কমে যাচ্ছে বলে
আমি আর গোলাপি করবীর উঁচু ডালে নাগাল পাই না
সেদিন সকালে উঠে দেখি,
এক ডাঁটি রজনীগন্ধা লম্বায় আমার সমান।

আমি সোজা হয়ে দাঁড়িয়েই গম্বু নিই তার।

এখন আমি ঘাসফুল আর

বুড়ো আঙুলের নখের মাপে চন্দ্রমল্লিকার সম্মানে আছি,

সমান উচ্চতা পেলে ঘ্রাণ নেবো বলে।

পৌশমী সেনগুপ্ত

পথনির্দেশ

আমাদের কোনো পাশের বাড়ি নেই।

এ ব্লক, বি ব্লক, সি ব্লক

তারপর খানিকটা গাঢ় আন্তাফুঁড়

বাতাসে এলিয়ে আছে।

এইসব পার হয়ে

আমাদের টার্যচোথ বাড়ি

আবলুশ দরজায় তিস্তবতী ঘন্টা ঝোলানো।

চলে এসো, সিঁড়িটার শেষ দেখে যাও

প্লানঘরে আখভেজা শাড়ি আর বালতির জল

কঁকে পড়ো চোখ খোলা রেখে

দেখবে নষ্ট হয় অন্যের বাড়ি

ভূমি আর বালতিটা গাড়িয়ে পড়ছে।

শ্রেষ্ঠ কবিতা

অমিয় দেব

সংকলন মাগেরই একটা অনুস্বর আছে। 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' পর্যায়ও তার বাতিক্রম নয়, কারণ শ্রেষ্ঠতার কোনো স্বতঃসিদ্ধি নেই, নেই ধ্রুব কর্তৃ বা ধ্রুব অধিকরণ। আজ যা শ্রেষ্ঠ কাল তাকে শ্রেষ্ঠ মনে নাও হ'তে পারে। আর একজনকে কাছে যা শ্রেষ্ঠ আরেকজন যে তাকেই শ্রেষ্ঠ ভাবে এমন নিশ্চয়তা কোথায়! আসলে 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' নাম্নী সংকলনগুলির নাম হওয়া উচিত ছিলো 'স্বনির্বাচিত কবিতা ১৯—'। এবং যেক্ষেত্রে লেখক মৃত সেক্ষেত্রে যিনি শ্রেষ্ঠতা নির্ণয় করেছেন তাঁর নামও মলাটে মুদ্রিত হওয়া উচিত। যখন পাঠক বই কিনবেন তখন তিনি জেনেই কিনবেন যে এই সংকলন সম্পাদিত হয়েছিলো স্বয়ং কবি কর্তৃক, এত সালে, বা কবির অভাবে তাঁর অমুক অনুরাগী কর্তৃক। আর নালিশ থাকবে না তখন পাঠকের, তিনি বলতে পারবেন না তাঁর প্রিয় কবিতা বাদ দিয়ে কেন 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' হয় সংকলিত। অথবা, শ্রেষ্ঠতা নিরূপণ হ'য়ে গেলে, আর একের এর এক আরো ভালো কবিতা লিখে চলেছেন কবি—এ কোনন! যদি হঠাৎ ভারি প্রকাশিত 'শত্ৰু ঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতা' হাতে আসে, মূদ্রণ ১৯৭০, তাহলে কি এমন কথা মনে হ'তে পারে না? নেই 'বাবরের প্রার্থনা', নেই 'মুর্খ' বুড়ো, সামাজিক নয়', অথচ শ্রেষ্ঠ! শ্রেষ্ঠ কথাটার মধ্যে একটা নিষ্পত্তির ভাব আছে বলেই এই গোলামাল।

কিছুদিন হ'লো এক জার্মান সাহিত্যতাত্ত্বিক এই রকম একটা ব্যাপারকেই বলছেন সাহিত্যের ইতিহাস, অর্থাৎ যুগে-যুগে যে ভিন্ন-ভিন্ন আন্দোলন ঘটে কোনো লেখার বা লেখকের তারই পরম্পরার নাম দিচ্ছেন তিনি ইতিহাস। কিন্তু একই সময়েও যে ভিন্ন-ভিন্ন আন্দোলন হ'তে পারে এক লেখার বা এক লেখকের তার কোনো খতিয়ান তিনি করেননি। অথচ ইতিহাস তো কেবল কাল নয়, ইতিহাস দেশও। আন্দোলনের এই দেশ কাল মেনে নিলে আমাদের শ্রেষ্ঠ কবিতা বিচার আর প্রকাশকের নিবন্ধমাত্র হ'য়ে থাকে না। শ্রেষ্ঠ যেখানে স্বনির্বাচিত

সেখানে লেখক মাঝে-মাঝে দাঁড়িয়ে নিজেকে পর্যবেক্ষণ করে নিচ্ছেন। ধরা যাক তাঁর মধ্য জীবনে প্রথমে বেরোলো এই গ্রন্থ, তারপর যখনই সংস্করণ হচ্ছে তখনই নিজেকে খানিকটা করে পাঠে নিচ্ছেন—খালি সন্মোজনই করছেন না, বিয়োগও করছেন কখনো-কখনো—এবং এইভাবে ফিরে-ফিরে স্বরূপের সন্ধান করছেন তিনি। বলা বাহুল্য, তদুপরি বা তদুপরি স্বরূপই তাঁর চ্যুত রূপ নয়। কিন্তু অন্য অনেক বীক্ষণ-লক্ষ্য রূপের মতো তাও তো একটি রূপ, অতএব মূল্যবান। তাছাড়া মাঝে-মাঝে এই রূপের সানুদেশেই রচিত হয় নতুন বীক্ষণ যার স্হ হ'তে পারে সবিময় বা সম্প্রসারিত হ'লে, এমনকি সম্ভবও।

‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’র ঘাটে-ঘাটে যে-স্বরূপ খুঁজে ফেরেন লেখকেরা তার কি কোনো সর্ববাদী আদর্শ আছে, নাকি লেখক-লেখকে এতই ভেদ যে কেউ নিজেকে দেখেন উদ্দেশ্য, কেউ অর্থ? অর্থ কেউ-কেউ পূনর্পূনর্বর্ষ প্রত্যক্ষ করছেন নিজের, আর কেউ-কেউ ঘুরে-ঘুরে সেই একই অতীত দেখছেন? নাকি অতীতহীন বর্তমান আর বর্তমানহীন অতীতের এক দ্বন্দ্ব চল অবিরাম? যাবতীয় স্বনির্বাচিত কবিতা, সমসংস্করণ, কাছে নিয়ে বসলে হয়তো এ-প্রশ্নের এক সম্ভূত মিলবে, কিন্তু ‘অলিঙ্গ’-সম্পাদক আমাকে মাত্র করেকটি ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’ বিষয়ে মনোযোগ দিতে বলেছেন। মদ্যব্রতম সীমাহিত এই কবিদের মধ্যে স্বরূপচৈতন্য সবচেয়ে জাগর বোধকরি শব্দ ঘোরের (‘আমার ভয় কেবল এই যে সমস্তটা মিলিয়ে আদ্যন্ত একটিকে-যে নাটক গড়ে উঠবার কথা ছিল, আজও তার অবশ্য দেখতে পাই না স্পষ্ট’।) আর বোধকরি এক ধরনের সৃষ্টি প্রাপ্ত হয়ে আছে এই স্বরূপচৈতন্য বিনয় মজুমদারের ক্ষেত্রে যার কবিতার প্রধান বিজয়ী হ'লো চৈতন্য। তাঁর ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’র কোনো ভূমিকা লেখনি বিনয় মজুমদার। অন্যকে অলোকগল্পন দাশগুপ্তের স্বরূপচৈতন্য রীতিমত দ্বিধাবিহীন। ‘রোমাঞ্চ, ধারাবাহিকতা’ নিয়ে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, আবার ‘পূর্ণ’তার প্রতিভাসকেও করেননি পূর্ণ নিমর্শন। বোধকরি দুইই তাঁর কাছে জরুরি। আর কোনো-কিছুই জরুরি নয়, ঘোষণা করে যে স্বরূপ চৈতন্য প্রকারান্তরে প্রদর্শন করেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তা আত। আঁত ক্ষেপেয়েই নেই শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের স্বরূপচৈতন্য, কারণ কবিতা তাঁর অবলম্বন। নিজেকে নিজের মতো

করে দেখার জল্পনা দর্পণ এক।’ অবশ্য নিজের যে-মুঠি তিনি রচনা করেছেন তাঁর স্বনির্বাচিত ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’র তার সঙ্গে যে পাঠকের মূর্ত্তি পুরো সংগতি না ঘটতে পারে, সে বিষয়ে তিনি সচল, পাঠকের কাছে ক্ষমাপ্রার্থীও, কিন্তু সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো না হলেও অতীত নিয়ে এক ধরনের ঐদামসীনা তাঁরও রয়েছে। তুলনায় প্রথমেই দাশগুপ্তের স্বরূপচৈতন্য স্থির, সম্ভবত আমার এই ঘটকবির মধ্যে সবচেয়ে নিবিধ (‘গাছের ডালপালা নানাদিকে ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু কাণ্ড ও শিকড় একই থাকে, বা যদি আরো একটু অন্যভাবে বলি, সমস্ত পরিবর্তন ও বিবর্তনের মধ্যেও একটা অচ্ছিন্ন সত্তা হয়তো কোথাও থেকে যার’।)।

কিন্তু স্বরূপচৈতন্য আমাদের অন্তিম বিচার্য নয়। আমরা পাঠক কবিতার, কবির নয়; অর্থাৎ কবির সার্বিক রূপ অবহিত না-হ'লেও আমরা কবিতা উপভোগ করতে পারি। এবং কোনো ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’র সব কবিতাই যে সমান উৎসাহে পড়বো তা নাও হ'তে পারে। কিছু কবিতা আমরা আদৌ না পড়তে উঠতে পারি। ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’র পরিধিতে একটি শ্রেষ্ঠতর কবিতাগুচ্ছ আমরা নির্ণয় করে নিতে পারি, আর কবি বিষয়ে যখন কিছু বলবার তখন ঐ গুচ্ছকে ভর করেই তা বলবো। যদি বলি শব্দ ঘোষ পড়াশের সবচেয়ে স্ফূর্ত্ত কবি এবং সেই জনেই সবচেয়ে জরুরি, শব্দকে দিয়ে সত্য বলিয়েছেন; বলি অলোক-গল্পন দাশগুপ্ত কেবল দুইই খুঁজেছেন—যেমন সহজ বিশ্বাসের তেমনি কঠিন বিশ্বাসহীনতার; কিংবা শক্তি চট্টোপাধ্যায় তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা-রাজির ডালপালায় দেখেছেন বোধ—তাকে জীবনবোধ বা মৃত্যুবোধ দুইই বলা যায়; যদি বলি তাঁর সহমাত্রী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ও অভিজ্ঞতার অঙ্গে আরোহী হয়ে একের পর এক আরারবরী খুঁজেছেন; অথবা শব্দ চৈতন্যসম্পন্ন উপলব্ধি জ্ঞাপন করেছেন বিনয় মজুমদার, উপমানে-উপমানে প্রপঞ্চপ্রসারী; আর তাঁর দৃষ্টিবিন্দনের সূতো ছেড়ে দিয়ে উদ্দেশ্য-অপেক্ষে টুকরো-টুকরো আকাশ বেঁচেছেন প্রণবন্দ্য দাশগুপ্ত, কখনো সোজাসজি কখনো অগাধে—যদি বলি এই ছয় কবি নিয়ে এই ছ-টি কথা, তার মানে এই নয় যে তাঁদের ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’র সবকিছু কবিতা পড়ে নিয়েই তবে বলছি, সম্ভবত কেবল শ্রেষ্ঠতর কবিতাগুচ্ছ করেকটি থেকেই এই উপলব্ধিসমূহ সজাত হয়েছে। অবশ্য তার মানে এও নয় যে সকল পাঠকই আমরা শ্রেষ্ঠতর কবিতামাত্র পড়ছি, কেউ-কেউ হয়তো পুরো

‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’ বলিই পড়ে ফেলছি। আর তার মানে এও নয় নিশ্চয়ই যে সকল পাঠক আমরা এই উপলব্ধিসমূহেই উপনীত হচ্ছি, উপলব্ধিসমূহের তারতম্য নয় কম বিপুল বা তাৎপর্যপূর্ণ। আমাদের পাঠ যেহেতু অশত আমাদেরই পাঠ, অর্থাৎ আমাদের শ্রেণী, বর্ণ, লিঙ্গ, শিক্ষা ইত্যাদি—সব মিলিয়ে আমাদের ইতিহাস—তত্ত্ব ক্রিয়াশীল, সেহেতু শব্দ ঘোষ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত ও বিনয় মজুমদারের চেষ্টারার তারতম্য আমাদের কাম্য। তবে শ্রেণী ও বর্ণের প্রভেদ বাংলা কবিতার বর্তমান পাঠক-মণ্ডলীর ক্ষেত্রে হয়তো বা তেমন বিপুল নয়, আর হয়তো বা সেই কারণেও কিংবা একা প্রতিভাত হয় পাঠে-পাঠান্তরে। এই ছয় কবির আন্তর সাম্য-অসাম্য নিয়ে খুব বিতর্ক বোধহয় ওঠে না। কোনো পাঠক হয়তো একটু বেশি কোঁকেন এই কবির দিকে, কোনো পাঠক ঐ কবির দিকে—জোড়ায় দেখার অভাস আমাদের কবে কাটবে—কেউ-কেউ হয়তো কেবল একেই মানেন অন্যদের তেমন তোয়াক্কা না করে, আবার কারোর-কারোর স্নেহ আর্বাতিত হয় ওঁকে ঘিরে অন্যেরা যেখানে নিতান্ত সন্মাহা; প্রতিষ্ঠা হয়তো কোনো-একজনকে করে তোলে দূর, আবার সম্মাননা সত্ত্বেও অন্য একজন থাকেন নিকটে—ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু ইত্যাকার তারতম্যকে যদি বলি আশ্বাদনের দেশ তবে আশ্বাদনের কালও তো আছে, তার টানেও তো কিছু তারতম্য ঘটে যাচ্ছে ধীরে-ধীরে। সেই তারতম্য নিশ্চয়ই সদা প্রতীমান নয়, অর্থাৎ নিতা নিশ্চয়ই আমরা বিত্ববান-বিত্ববতীর জামা পাষ্টানোর মতো করে আমাদের প্রীতি-সপ্রীতি বিষয়ে সজাগ হয়ে উঠি না, কিন্তু ভিতরে-ভিতরে কাজ করতে থাকে কাল আর একসময়ে তা আকারে-প্রকারে প্রকাশ হয়ে পড়ে। কিন্তু কালের তো কোনো স্বয়ংক্রিয়তা নেই, নেই কোনো অজ্ঞেয় রহস্য। কাল আমরা পাঠকেরাই, আমাদের ইতিহাসই আমাদের ধীরে-ধীরে পাষ্টাতে থাকে আর আমরা মানে একা আমাদের বহুবচন যেমন নয়, তেমন নয় বহু আমরা একই সমাবেশ, অর্থাৎ আমাদের মধ্যে আছে কতিপয় সচল ও পরিবর্তনশীল মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গি, যুগপৎ ইতিহাসোদ্ভূত ও ইতিহাস-রচয়িতা।

কিন্তু পাঠক নামক আমাদের সমভিভাব্যতার আরেকটা কথা বোধহয় ভাবা যায়। যাদের ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’র সূত্র ধরে এই অণুচিন্তন

আমি করছি, তাঁরা এখন সকলেই সুপ্রতিষ্ঠিত, এতটাই প্রতিষ্ঠিত যে তাঁদের নিয়ে আর তেমন মাতামাতি করে না তরুণেরা, কোনো উত্তেজনা ব’য়ে যায় না লিটল ম্যাগাজিনে-ম্যাগাজিনে যখন কোনো নতুন বই বেরোয় তাঁদের, ঈর্ষ প্রবলতার দিকে এখন পা হাটছেন তাঁরা, নিজের-নিজের উচ্চারণে মগ্ন। যাকে বলে আন্দোলন তার সঙ্গে আর প্রত্যক্ষ যোগ এখন কোথায় তাঁদের? যোগ বা আছে তা নিতাই পেরোয়, প্রভাবে-পরিভাবে যেভাবেই হোক না কেন, পেরোয়। এখনকার বিতর্কে আর সত্যিকার অংশ নেই তাঁদের; যদি সৃষ্টি ও প্রগতি নিয়ে চলে বিতর্ক তাহা তার নিপত্তি হয়ে তরুণদেরই হাতে। আর যেখানে নিপত্তি হবার নয় সেখানে বিভক্ত হবেন তরুণেরাই, আমার এই শ্রেষ্ঠ কবিতা স্পৃষ্ট হবেন না সেই বিভাজনে। পৃথগ্বে-ঘাটে যারা বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন কবিতায়, তাঁদের বিপ্লব এখন আত্মদেপদী। কবিতার বিপ্লব ঘটাচ্ছে এখন অন্য আরেকদল, তাঁরা সমর্থন করুন চাই না করুন ঐ-বিপ্লব ঘটে চলেছে। অতএব শ্রেষ্ঠ কবিতার আশ্বাদনের কালক্রম কিছুটা এই ঘটনায় বিপ্লবনির্ভর।

শব্দ ঘোষের ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’ বোঝিয়েছলো তাঁর আটত্রিশ বছর বয়সে, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের তাঁর সীহরিণ বছর বয়সে, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের তাঁদের চল্লিশ বছর বয়সে, বিনয় মজুমদারের তাঁর সাতচল্লিশ বছর ও প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের তাঁর একত্রিশ বছর বয়সে। তিনের দশকে যাদের জন্ম, পাঁচের দশকে কবিতা ছাপিয়ে যারা রীতিমত হেঁটে তুলে দিয়েছিলেন, সাতের-আটের দশকে তাঁদের ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’ প্রকাশ সংগত। কিন্তু আমরা কাছে যেহেতু তাঁদের কবিতার বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে বেড়েছে, তাই আমরা কাছে তাঁদের ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’ আর তাঁদের সাম্প্রতিক পাঠকদের কাছে তাঁদের ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’র তাৎপর্য কিংবা আলাদা। আমি হয়তো তাঁদের ক্রমবিবর্তন তেমন স্পষ্ট করে দেখি না—আমার দৃষ্টি খানিকটা আচ্ছন্ন হয়ে থাকে স্মৃতিতে। তার মানে, ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’র যথার্থ পাঠক বলে যদি কেউ থাকে আমি নিশ্চয়ই তা নই, এমনকি আমার হয়তো নিজেকে প্রচার করা উচিত রীতিমত অযথার্থ পাঠক হিসেবে। তার মানে কি এও যে এই ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’ ছ-টির অভীষ্ট পাঠক আমার বয়সী কেউ নন? ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’ যখন বেরোচ্ছে তখন যারা প্রধান কবিতা-পাঠক—বয়সে, ভাবনায়, সমসাময়িক সম্পৃক্তিতে—মূলত তাঁদের জন্যেই এই

গ্রন্থমালা। প্রকারান্তরে আমি গ্রন্থ-প্রকাশের কালকে এক নিরঙ্কুশ তথ্যমাত্র ভাবছি না, অনুমান করছি তারও একটা ভূমিকা আছে আশ্বাদনের প্রকৃতি নিগ্নে। ‘অভীষ্ট’ অর্থ এই নয় যে রচয়িতা যোলা আনা সচেতন (যোলা আনা যখন লিখে ফেলেছি তখন আর বয়স লুকোবো কী করে), উচ্চারণ করে ব’লে দিচ্ছেন তাঁর নিবেদন কার কাছে। কিন্তু মিছিলের মূখের মতোও একটা অস্পষ্ট আভাস বোধ করি তাঁর থাকে, নিতান্ত শূন্যের হাতে তিনি নিশ্চয়ই গ্রন্থ তুলে দেন না। একথা বলছি না যে অভীষ্ট পাঠকই একমাত্র, ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’র দরজা আমার জন্য বন্ধ—কিন্তু সদর-সদর বলে কথা তো আছে। বৃন্দদেব বসু একবার তরুণতম কবির একটি ছোটো কালপর্বী উল্লেখ করেছিলেন। সেই উপমানে বলতে পারি তিন দশক আগে বাংলা কবিতার অভীষ্টতম পাঠক ছিলাম আমি, আমার পরে সে-আসন পয়েছিলেন অন্য কেউ, তারও পরে আরো কেউ, এখন বাংলা কবিতার অভীষ্টতম পাঠক ‘অলিন্দ’-র তরুণ গ্রাহকবৃন্দ। আশংকা হচ্ছে, এই ছ-টি ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’ নিয়ে অণুচিন্তনের আজ্ঞা দিয়ে ‘অলিন্দ’-সম্পাদক নিতান্ত বন্ধুত্ব করেছেন—আমার অণুচিন্তন কিছূতেই যথার্থ হবে না।

কী মুশকিল যদি মূল্যনিরূপণ করতে হয় আমাকে! অভীষ্টতম পাঠকের মতো আমি কি বলতে পারি একেই আমার দরকার, অন্যদের না হ’লেও চলবে? তিন দশক আগে তা বলতে পারতাম এবং হয়তো চায়ের নেশায় এখানে-ওখানে বলেওছি। সেই ঔজ্জ্বল্যের একটা কালোচিতা আছে। কাল আমাকে সেই ঔচিত্যের বাইরে এনে ফেলেছে এখন। আমার ভালো লাগা না-লাগার, রোমাণ বা রোমাণুহীনতার, চৈতন্য-জাগতি কি অজাগতির কথা যদি এখন লিখতে বসি সেটা হয়ে যাবে ডায়েরি। আর ডায়েরি তো কেউ একদিনে বসে সব লিখে ফেলে না, ডায়েরি লেখা হয় অনেকদিন ধরে। তাছাড়া ডায়েরি বড়ো একান্ত কালক্রম, ইতিহাসে তার মূল্য ঐকান্তিকতার জন্যেই। স্মৃতিধারণ হয়তো করা যেতো, কিন্তু তার সুখ অনেকসময় তার সত্যের বাধা হ’য়ে দাঁড়ায়। আর ‘অলিন্দ’-সম্পাদক আমার কাছে চেয়েছিলেন নিম্নখ। কিন্তু ইতিহাসের উল্টোপথে হেঁটে আমার বয়সী কবিদের ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’ বিষয়ে নিবন্ধ রচনা আমার পক্ষে কী করে সম্ভব? ‘অলিন্দ’-সম্পাদক ও পাঠকদের কাছে আমার অক্ষমতার জন্যে মার্জনা চাইছি।

চিংকার

চকমিলানো বাড়ি তার পিছনদিকে আলো
সামনের বাগানে ফুটে অনন্ত মগ্নিকা
অশ্বকারও অশ্ব কামে প্রোথিতভর্তৃকা
সেইখানে নীল গৃহার মধ্যে বিদ্যুৎ চমকালো

সম্ভাবনার ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে দৌঁখ
আকাশ জুড়ে ধ্বমকে গৃহাচিরের সভতা
বৃকের মধ্যে ভাঙতে থাকে সাতরাজের চৌকি
নারীর অধেন গানে বজ্রাহত শ্রোতা

চকমিলানো বাড়ি তারই সামনে স্বয়ংস্বরায়
নগ্নকাকে জড়িয়ে নারী দেহেই শৃঙ্খল আকার
হাড়ের বিষ্ণুরূপে আঁকা মুখ গিয়েছে খরায়
পিছনে গৃহা গৃহার মধ্যে আমারই চিংকার...

যোগাযোগ

তুমি অন্ধকার থেকে ঘোরলাগা মৌমাছির মতো
শব্দের বিলিক তুলে এলে—
আমি স্পষ্ট রং দেখতে পেলাম, লাল, ককঁশ কাপিশ, কিছুটা গোলাপী।
এখন যেখানে আছি সেখানে সমুদ্রের ঢেউ সব শেষ হয়ে গেছে,
অন্ধকার পড়ে আছে যোজন যোজন কোনো বিস্মৃতির মতো,
আমি তো তোমার কথাই ভাববো এখন, অন্য কিছু নয়,
আর আমার ভাবনা থেকে চক্কাকার অজস্র গুঞ্জন
মৌমাছি, মৌমাছি, নাকি কিছু নয়, শুধু ধনি,
এতো রং পৃথিবীর ঠিক একই নিচে, নাকি সমুদ্রের নিচে
লুকিয়ে ছিলো যে আমি বৃষ্টিতে পারিনি,
আমি জীবনের সাথে ঐ স্পন্দমান শরীরের সাথে
সেই তোমাকে করেছি যোগ,
তখনই অজস্র রং, পতঙ্গের এরোপ্লেন, মর্মরিত বীথী
হঠাৎ আমার গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে—
আমি তীক্ষ্ণভাবে বেঁচে যে উঠলাম, সে কি তোমার আদেশে?

চড়ুইভাতি

একটু প্রথমে সঁরে এসে তারপর পাতা-লেগে-থাকা দরজার ওপারে
আজ্ঞে, আতুর মাঠে চলে যাই।
ভালোই তো, তোমারা এসেছে, আজ একটু চড়ুইভাতির প্রয়োজন।
গালগল্পে সময় কাটতে গিয়ে আমরা হয়তো প্রত্যেকের আরো একটু কাছে
চলে আসতে পারি; চাঁদ উঠলে তক্ষকের মতো ডাক দিয়ে
ফিরে আসতে পারি সেই পুরনো দরজা দিয়ে
ছোটো ছোটো আমাদের ঘরে।

এ-প্রহরে আর কিছু নেই, শুধু প্রতীক্ষার ঘড়ি ঐ টাঙানো দেওয়ালে,
আর তোমরা আসবে কি আসবে না এখনো জানি না,
এই ঘরবাড়ি-ঘেরা মাঠের ওপরে
আমরা কি আমাদের বিষয় মূখ্যাস
গাছের পুরনো ছালের মতো পারবো ফেলে দিতে?
নিভতে অনেক কথা হ'লো, এখন একটু একযোগে
গনগনে উনুনের আঁচে সমবার খিচুড়ি ফুটিয়ে
আমরা ধরবো গান, গাল দেবো, হেসে উঠবো জোরে॥